

বাংলাদেশের পরিবার ও বিবাহ ব্যবস্থা, পরিবর্তন এবং ভবিষ্যৎ : একটি সমাজতাত্ত্বিক পর্যালোচনা

আনিসুর রহমান খান*

Abstract: Throughout the ages, the family has been a fundamental group of the world. It has been called the corner-stone of society, credited with being a primary force for controlling as well as civilising the human beings, and viewed as the source of morality and descent behaviour. The foundation of family is predominantly rooted in marriage- a socially recognised institution essential for the procreation of children and satisfaction of sexual urges. The patterns and activities of family and marriage show a fascinating variation from society to society, but a constant flux of change. As the important parts of social structure, both family and marriage system, their change and fate as well have drawn a considerable degree of attention to sociologists. In a traditional society like Bangladesh both family and marriage are considered to be the cradles of social life, and enjoy their supremacy above all other existing social institutions/groups. In this study attempts have been made to get insight of the family and marriage structure of Bangladesh, their functions, changes, and about the future in the light of sociological outlook and perspective with view to better understanding the social structure.

১.০ ভূমিকা

মানুষ সামাজিক জীব, সামাজিক জীব হিসেবে একত্রে বসবাসের তাগিদে মানুষ যেসব প্রতিষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে তার মধ্যে পরিবার এবং বিবাহ অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাচীন। পরিবারকে কেন্দ্র করেই মানুষের জীবন বিচিত্র মিথস্ক্রিয়ার আবর্তিত হয় যেহেতু পরিবারের মধ্যেই মানুষ জন্ম নিয়ে জীবন শুরু করে এবং মৃত্যু অবধি সেখানেই জীবন অতিবাহিত করে। পরিবারকে বাদ দিয়ে কোন মানব সমাজের অস্তিত্ব কল্পনা করা কঠিন। সেজন্য সমাজ বিজ্ঞানীরা পরিবারকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সর্বজনীন সামাজিক গোষ্ঠীর মর্যাদা দিয়েছেন। পরিবারের মূল ভিত্তি হল বিবাহ এবং বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমেই পরিবারের স্থায়িত্ব নির্ভর করে। বিবাহের মাধ্যমে পরিবার গঠন না করলে মানবজাতি কোন দিনই বর্তমান উন্নত পর্যায়ে আসতে পারত না। বিবাহ হল সমাজ স্বীকৃত একটি পবিত্র বন্ধন, যা পরিবারের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে এবং পারিবারিক বন্ধনকে স্থায়ী ও সুসংহত

* সহকারী পরিচালক, বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা

করে। পরিবার গঠনে বিবাহের আবশ্যিকতা সম্পর্কে বলা হয়, ‘Marriage is rooted in family rather than family in marriage’. সুস্থ সমাজ জীবনে পরিবার ও বিবাহের উপস্থিতি এবং প্রয়োজনীয়তা এতই ব্যাপক ও বহুমুখী যে, সমাজবিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানীরা এসবের ব্যাখ্যা, উৎপত্তি, কার্যকারিতা এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে ব্যাপক তথ্যানুসন্ধান করে চলেছেন।

বাংলাদেশের মত একটি ঐতিহ্যবাহী সমাজের কাঠামোতে স্মরণাতীতকাল হতে পরিবার ও বিবাহ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে এবং সমাজ কাঠামোর মূল ভিত্তি তথা চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছে। যাবতীয় সামাজিক কার্যক্রমে পারিবারিক বন্ধন এবং বৈবাহিক সম্পর্ক তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, সেজন্য এদেশের সামাজিক সম্পর্ক আজও শক্ত বাঁধনে গ্রথিত। তবে একথা সত্য, সমাজ সদা পরিবর্তনশীল এবং পরিবর্তনের স্বাভাবিক নিয়মে সমাজকাঠামোর অন্যতম মৌল ভিত্তি পরিবার সংগঠন এবং বিবাহ ব্যবস্থায় আসছে পরিবর্তন। সকল সমাজেই, বিশেষ করে শিল্পোন্নত পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্থায় পরিবার ও বিবাহের সাম্প্রতিক দ্রুত পরিবর্তন প্রক্রিয়ার গতিধারা উপলব্ধি করে সমাজ বিজ্ঞানীরা এদের কার্যকারিতা সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করার প্রয়াস পেয়েছেন। বাংলাদেশের পরিবার সংগঠন ও বিবাহ ব্যবস্থাতেও আসছে নানামুখী পরিবর্তন এবং পরিবর্তনের এই ছোঁয়া বাংলাদেশের সমাজ কাঠামোকে যথেষ্ট পরিমাণ নাড়া দিচ্ছে। বর্তমান আলোচনায় আমরা সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে দেখার চেষ্টা করব বর্তমান বাংলাদেশের পরিবার ও বিবাহ ব্যবস্থার রূপভেদ, পরিবর্তন প্রক্রিয়া এবং সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ। তবে মূল আলোচনায় যাবার পূর্বে পরিবার ও বিবাহ প্রত্যয় দুটোকে সমাজবিজ্ঞানী ও সামাজিক নৃবিজ্ঞানীরা কিভাবে ব্যাখ্যা করেছেন এবং সমাজে পরিবার ও বিবাহের উৎপত্তি সম্পর্কে ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়।

২.০ বিবাহ ও পরিবারের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা, উৎপত্তি এবং বিকাশ

পরিবার সংগঠন ও বিবাহ ব্যবস্থা অবিচ্ছেদ্য, একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটির আলোচনা পূর্ণাঙ্গতা পায় না- যদিও বিবাহ ও পরিবার এক নয় এবং এদের মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। শুরুতেই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে নেয়া প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে নৃবিজ্ঞানী ম্যালিনোস্কি বলেন, “পরিবার একটি গোষ্ঠী বা সংগঠন, অন্যদিকে বিবাহ হল সন্তান উৎপাদন ও পালনের একটি চুক্তি মাত্র” (উদ্ধৃত, কোনিগ : ১০৬)। তিনি আরও বলেন, “একটি নারী এবং পুরুষের মধ্যে আগামী সংসার বা পারিবারিক জীবনের সুযোগ ঘটিয়ে দিবে বিবাহ। বিবাহ তাদের সুযোগ দিবে সন্তান প্রসবের ও প্রতিপালনের” (উদ্ধৃত, হোসেন : ৭৩)। আর এই সন্তান প্রসব ও প্রতিপালন কার্যক্রম দ্বারাই বিকশিত হয় পারিবারিক পরিমণ্ডল। নৃবিজ্ঞানী ওয়েস্টারমার্ক, যিনি আজীবন পরিবার ও বিবাহ নিয়ে গবেষণা করেছেন; যদিও নিজে ছিলেন অবিবাহিত, তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ “History of Human Marriage” -এ বিবাহ সম্পর্কে বলেন, “বিবাহ হচ্ছে মেয়ে ও পুরুষের মধ্যে একটি কমবেশি স্থায়ী সম্পর্ক, যা কেবল সন্তান জন্মদান পর্যন্তই স্থায়ী হয় না, এর পরেও

এর কাজ থাকে।” (উদ্ধৃত, নকী : ১১৪)। বার্ট্রান্ড রাসেল আরও সহজভাবে বলেন, বিবাহ হচ্ছে শুধুমাত্র a relation between men and women (Russel:85)। এ সম্পর্কে প্রাথমিকভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যৌনসম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে, আর বিবাহ ব্যবস্থা ব্যতিরেকে যৌন উচ্ছৃঙ্খলতার আশংকাকে এড়ানো যায় না। মূলকথা, বিবাহ সমাজ স্বীকৃত ধর্মীয় ও আইনগত অনুষ্ঠান যা স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে একটি প্রাতিষ্ঠানিক বন্ধন সৃষ্টি করে। বিবাহ শুধুমাত্র সন্তান জন্মদান এবং যৌন কামনা চরিতার্থ করার উপায় নয়, বরং বিবাহিত ব্যক্তিবর্গ আর তাদের সন্তান বা সন্তানসমূহের জন্য নির্দিষ্ট কতগুলো অধিকার ও কর্তব্যের সৃষ্টি করে যেগুলো প্রাথমিকভাবে পালিত হয় পরিবার নামক সংগঠন দ্বারা। অর্থাৎ বিবাহের মাধ্যমে পরিবার সমাজে স্বীকৃতি লাভ করে এবং স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এজন্যই বিবাহকে পরিবারের প্রস্তুতি বা ভিত্তিমূল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অন্যদিকে পরিবারকেও সমাজ-বিজ্ঞানীরা নানা আঙ্গিকে ও বিচিত্র প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করেছেন। সমাজ বিজ্ঞানী মার্ডক বলেন, “পরিবার হল মোটামুটি স্থায়ীভাবে একত্রে বসবাসকারী স্বামী-স্ত্রী বা নর-নারী। তাদের সন্তান থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে” (উদ্ধৃত, মহাপাত্র : ২৫৫)। অন্যদিকে উইন্চ তাঁর ‘The Modern Family’ গ্রন্থে পরিবারের একটি আধুনিক সংজ্ঞা দিয়েছেন, তাঁর মতে, “পরিবার হল দুই বা ততোধিক ব্যক্তির একটি গোষ্ঠী যা গঠিত হয়েছে বৈবাহিক সম্পর্ক, রক্ত সম্পর্ক বা দত্তক গ্রহণের ফলে সৃষ্ট সম্পর্কের ভিত্তিতে, যারা নির্দিষ্ট একটি বাসস্থান গড়ে তুলেছে, যারা পারিবারিক কাজকর্মে পরস্পরের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করে, এবং এক অভিন্ন সংস্কৃতি সৃষ্টি ও সংরক্ষণ করে” (প্রাগুক্ত : ২৫৫)। পরিবার সম্পর্কিত এসব সংজ্ঞায় এটি স্পষ্ট যে, পরিবার প্রাথমিকভাবে একটি জৈব একক- যার মধ্য দিয়ে স্বামী-স্ত্রীর যৌন সম্পর্ক আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি পায়। প্রজনন প্রক্রিয়ার ধারাবাহিক বিকাশ ধারায় পরিবারের সদস্যদের জন্ম হয়; আর এইভাবে সৃষ্ট সদস্যদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে এবং তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সুনির্দিষ্ট হয়। আর এজন্য পরিবার সমাজের ক্ষুদ্রতম সামাজিক এককও, যার সদস্যরা কমবেশি সবাই একত্রে বাস করে এবং অর্থনৈতিক কাজ-কর্মে যোগ দেয়। পরিবারে কখনও কখনও অন্তর্ভুক্ত হতে পারে পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন সম্পর্ক, অর্থাৎ যেখানে সন্তানাদিসহ অন্যান্য জ্ঞাতিরাও বসবাস করে বা করতে পারে। কিন্তু বিবাহ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পারিবারিক পরিমণ্ডলে রক্তসম্পর্কের এই বিকাশই পরিবারকে সমাজের অন্যান্য গোষ্ঠীর তুলনায় স্বতন্ত্র মর্যাদায় আসীন করেছে। তাই সমাজবিজ্ঞানীরা মনে করেন, “The family is the only social institution other than religion which is formally developed in all societies” (cited in Goode : 4)। একথা বলা আবশ্যিক, পরিবার ও বিয়ের এমন কোন সংজ্ঞা দাঁড় করানো সম্ভব নয়, যা হবে বিশ্বজনীন (universal), অর্থাৎ যা সকল স্থান এবং সকল সময়ের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। আধুনিক সমাজবিজ্ঞানী ও সামাজিক নৃবিজ্ঞানীদের মতে এ দুটো প্রত্যয়ের বিশ্বজনীন সংজ্ঞা দাঁড় করানোর প্রচেষ্টা (অতীতে যা করা হয়েছে) ব্যর্থ হতে বাধ্য, কেননা এতে বিদ্যমান সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভিন্নতা অনুধাবন দুরূহ হয়ে পড়ে এবং ক্ষেত্র বিশেষে পরিবার ও বিবাহের নানা দিক সম্পর্কে জ্ঞান আহরণের রাস্তা কার্যতঃ বন্ধ করে দেয়। এজন্যই আধুনিক তাত্ত্বিকরা গুরুত্ব দিচ্ছেন নির্দিষ্টতার উপর- যার মূল লক্ষ্য হচ্ছে নির্দিষ্ট কোন সমাজে, নির্দিষ্ট কোন জনগোষ্ঠীর মধ্যে বা নির্দিষ্ট কোন সময়ে কি ধরনের

পরিবার বা বিয়ে ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল বা আছে এবং এদের বৈশিষ্ট্য কিরূপ (আহমেদ চৌধুরী : ৭৪)। সে আলোকেই আমরা বাংলাদেশের মত নির্দিষ্ট একটি সমাজের পরিবার ও বিবাহের নানা প্রেক্ষাপট আলোচনা করব- পরিবার ও বিবাহের উৎপত্তি ও বিকাশের ক্ষেত্রে বিভিন্ন নির্দিষ্ট সমাজ, জনগোষ্ঠী ও সময়ের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় রেখে।

মানব সমাজে পরিবার ও বিবাহ প্রথার কিভাবে উৎপত্তি হল সে সম্পর্কে নৃবিজ্ঞানী বা সমাজ বিজ্ঞানীদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। পরিবার ও বিবাহের উৎপত্তি সম্পর্কে দু'ধরনের মতবাদ রয়েছে। প্রথম অভিমত অনুসারে আদিম মানুষের সমাজ ব্যবস্থায় কোন রকম বিবাহ ব্যবস্থার অস্তিত্ব ছিল না, এবং সেজন্য পরিবার প্রথাও তখন গড়ে উঠেনি। জীবজগতের অন্যান্য প্রাণীর মত আদিম মানুষ অবাধ যৌন সম্পর্কে সামিল হত। মানব সমাজে অবাধ যৌন মিলনের পর্যায় থেকে ধাপে ধাপে বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে পরিবার প্রথার সৃষ্টি হয়েছে। এই মতবাদে পরিবার ও বিবাহের উৎপত্তি বিবর্তন ধারার মাধ্যমে বুঝানো হয়; তাই একে সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিবর্তন বলা হয়। ব্যাকোফন, লুইস মর্গান, ফেজার, ব্রিফল্ট প্রমুখ বিখ্যাত সমাজ নৃবিজ্ঞানীরা এই মতবাদের প্রবর্তক। ব্যাকোফন তাঁর 'The Mother Right' গ্রন্থে অবাধ যৌনাচারের তত্ত্বে বলেন আদিম সমাজে যৌন জীবনের উপর কোন সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ছিল না, মায়ের পরিচয়েই সন্তান পরিচিত হত। পরবর্তীকালে মাতার আর্থ-সামাজিক স্বার্থ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা থেকেই মাতৃতান্ত্রিক বা মাতৃঅধিকার ভিত্তিক পরিবারের বিকাশ হয়। কিন্তু এই অবস্থা আস্তে আস্তে পরিবর্তিত হয়ে পুরুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজে পিতৃসূত্রীয় বা পিতৃঅধিকার ভিত্তিক পরিবারের উৎপত্তি হয় (প্রাণ্ডজ : ৯৬)। নৃবিজ্ঞানের অন্যতম জনক হেনরী লুইস মর্গান রেডইন্ডিয়ান ট্রাইব ইরকুয়াদের সাথে দীর্ঘদিন বসবাস করে তাদের kinship terminology বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে উপনীত হন - মানব সমাজে পরিবার অবাধ যৌন জীবন পর্যায় থেকেই ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন রূপ বিবাহ প্রথার (১. স্বগোত্র ভাই-বোন বিয়ে, ২. দলগত বিয়ে, ৩. জোড় বিয়ে, ৪. বহুস্ত্রী বিয়ে, ৫. একবিয়ে) উপর ভিত্তি করেই আধুনিক এক-বিবাহ ভিত্তিক পরিবারে স্থিতি লাভ করেছে। তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'Ancient Society'তে বিবাহের ভিত্তিতে পরিবার বিকাশের বিভিন্ন পর্যায় সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তবে মর্গানের উল্লেখযোগ্য অভিমত হল অধিকতর আদিম মাতৃতান্ত্রিক পরিবার থেকেই আজকের উন্নত পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের জন্ম, এবং বিবাহ প্রথা দ্বারাই পরিবারের স্বরূপ নির্ধারণ করতে হয় (মর্গান : ৩৬৬)। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, সমাজতন্ত্রী লেখকরাও পরিবারের বিবর্তন ব্যাখ্যায় মর্গানের তত্ত্বকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেছেন। ফ্রেডরিক এঙ্গেলস তাঁর 'The Origin of the Family, Private Property and the State' গ্রন্থে মর্গানের তত্ত্বকে সমর্থন করেন। তাঁর মতেও আদিম মানুষ পূর্ণাঙ্গভাবে মানবিক হবার পূর্বে অবাধ যৌনাচারে অভ্যস্ত ছিল। কালক্রমে নানা ধারাবাহিকতায় পরিবারের উদ্ভব হয়, এবং এটি একটি ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃত, কারণ এর অতীত ও বর্তমান আছে এবং সদা পরিবর্তনশীল (আহমেদ ও চৌধুরী : ৯৬)। অন্যদিকে ব্রিফল্ট তার 'The Mother' গ্রন্থে বিভিন্ন তথ্যের সমাবেশে দেখাতে চেষ্টা করেছেন কিভাবে অবাধ যৌনাচারের স্তর পেরিয়ে মাতৃতান্ত্রিক পরিবারের বিকাশ হয়েছে। তিনি

আরও বলেন আদিম মেয়েরা অবাধ যৌন জীবনের এক পর্যায়ে বুঝতে পেরেছিল পুরুষদের সাথে এক সাথে থাকলে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সুবিধা হবে, তখন তারা বিবাহের মাধ্যমে পুরুষদের সঙ্গে স্থায়ীভাবে আবদ্ধ হল। অর্থাৎ মাতার অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সেই সঙ্গে শিশুর নিরাপত্তার জরুরী প্রয়োজনে পরিবারের উদ্ভব। তবে তিনি বিভিন্ন দেশের এবং বিভিন্ন উপজাতির উদাহরণ দিয়ে বলেন, মেয়েরাই পরিবারের সৃষ্টি করেছে এবং সমস্ত শিল্পকলার স্রষ্টা হচ্ছে তারা (নকী : ১২৫)।

অন্যদিকে দ্বিতীয় ধারার সমাজ ও নৃবিজ্ঞানীরা পরিবার এবং বিবাহের প্রাথমিক রূপ সম্পর্কিত উপর্যুক্ত বক্তব্যকে স্বীকার বা মেনে নিতে চান না, বরং সম্পূর্ণ ভিন্নমত পোষণ করেন। এ প্রসঙ্গে নৃবিজ্ঞানী ওয়েষ্টারমার্কের অভিমত যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর মতে মানুষ কোনদিনই অবাধ যৌন জীবনযাপন করত না, বরং গোড়া থেকেই এক বিবাহ প্রথায় অভ্যস্ত ছিল। অবাধ যৌন আচরণ জীব ধর্ম বিরোধী, কেননা আশ্চর্যজনকভাবে পশু-পাখীও খাদ্য ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পারিবারিক পরিমণ্ডলে বসবাস করে বলে তিনি মনে করেন। ওয়েষ্টারমার্ক জীববিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞানের বিভিন্ন গবেষণালব্ধ জ্ঞানকে মূল্য দিয়ে তাঁর তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন। তিনি তাঁর যুক্তিতে বলেন পুরুষের মধ্যে মালিকানা সূচক কর্তৃত্ব এবং সম্পত্তি সম্পর্কে অধিকার-বোধের ধারণা থেকে পারিবারিক ব্যবস্থায় পতির কর্তৃত্ব সব সময়ই ছিল। তাঁর মতে পুরুষের ঈর্ষা, অধিকার-বলের আধিপত্যবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য পরিবারের সৃষ্টি এবং এভাবেই বিকশিত হয় এক-বিবাহ ভিত্তিক পিতৃতান্ত্রিক পরিবার (কোনিগ : ১১৩)। সমাজবিজ্ঞানী হেনরী সামনার মেইন, পিতৃতান্ত্রিক বা পিতৃসূত্রীয় পরিবার হল সর্বজনীন- এ মতবাদের অন্যতম প্রধান প্রবক্তা। মেইন তাঁর ‘Ancient Law’ গ্রন্থে প্রাচীন গ্রীস ও রোম হতে প্রাপ্ত সাক্ষ্যপ্রমাণাদির ভিত্তিতে যুক্তি দাঁড় করান যে, আদিম যুগে মানব সমাজ বলতে বুঝাতো পিতৃসূত্রীয় পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা। গ্রীস ও রোমের সমাজে পিতার একচ্ছত্র ক্ষমতা ও অধিকার বলের উদাহরণ দ্বারাই তাঁর মধ্যে এ ধারণার সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে। তাঁর মতবাদ অন্যান্য বিবর্তনবাদী তাত্ত্বিকদের অভিমত-বিরুদ্ধ যারা মাতৃতান্ত্রিক পরিবারকে আদিম পরিবার হিসেবে মনে করেন (আহমেদ ও চৌধুরী : ৪০৩)। তেমনি আধুনিক সমাজবিজ্ঞানী মার্ডকও বিবর্তনবাদীদের মত পরিবারের প্রাথমিক রূপ হিসেবে অবাধ যৌনাচার স্তর পেরিয়ে আস্তে আস্তে বেড়ে উঠা মাতৃতান্ত্রিক পরিবারের অস্তিত্বকে স্বীকার করেননি। তিনি তাঁর ‘Social Structure’ গ্রন্থে পরিবারের প্রাথমিক রূপ হিসাবে পিতৃতন্ত্রের কথা বলেন। যাহোক, পরিবার ও বিবাহের উৎপত্তি সম্পর্কে সমষ্টিগতভাবে দু’ধরনের মতবাদ দেখা যায়। প্রথমটির মূল বক্তব্য হল সমাজ সংগঠনের শুরুতে পরিবার ও বিবাহ বলতে কিছু ছিল না, মানুষ অবাধ যৌন জীবন স্তর থেকে আস্তে আস্তে বিবাহের মাধ্যমে পরিবার প্রথায় সংঘবদ্ধ হয়। এক্ষেত্রে মাতৃতান্ত্রিক পরিবারই পরিবারের অন্যতম প্রাথমিক রূপ বলে তাঁরা মতামত প্রকাশ করেন। বিপরীতক্রমে, দ্বিতীয় মতবাদ অনুসারে মানুষ শুরু থেকেই পিতৃতান্ত্রিক বা পিতৃসূত্রীয় পারিবারিক জীবনে সংঘবদ্ধ ছিল, যা অবাধ যৌনাচার মতবাদের সম্পূর্ণ বিরোধী। এ মতবাদের প্রবক্তাদের মতে অবাধ যৌনাচার কখনই মানব সমাজে দৃশ্যমান নয়। তবে পরিবারের ক্ষেত্রে মাতৃতন্ত্র বা পিতৃতন্ত্র, মাতৃসূত্রীয় বা পিতৃসূত্রীয় যেটাই আগে

আসুক না কেন, পিতৃসূত্রীয় বা মাতৃসূত্রীয় রীতির আওতায় আদিম বিবাহের রূপ নির্ণয় এক জটিল কাজ বলেই নৃবিজ্ঞানী বা সমাজবিজ্ঞানীরা মনে করেন। সমাজ-সংস্কৃতি ভেদে কোথাও বহুবিবাহ (বহু-স্ত্রী বিবাহ ও বহু-স্বামী বিবাহ), কোথাও একবিবাহ এবং কোথাও বা গোষ্ঠী বিবাহের (একাধিক পুরুষের সঙ্গে একাধিক মহিলার বিবাহ) অস্তিত্ব প্রাথমিক রূপ হিসেবে দৃশ্যমান হয়। তবে উল্লেখ্য বহুস্বামী গ্রহণ এবং গোষ্ঠী-বিবাহ মানব সমাজে খুবই বিরল। সমাজবিজ্ঞানী হবহাউজ, হুইলার এবং জিসবার্গ তাঁদের পরিচালিত এক অনুসন্ধানে ৪৩৪টি আদিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে ৬৬টি এক বিবাহ, ৩১টি বহুস্বামী গ্রহণ এবং অন্যান্য বহুস্ত্রী বিবাহ প্রথার অনুসারী ছিল বলে ধারণা করেছেন। এ হিসেব মতে বলা যায় যে, অধিকাংশ আদিম সমাজেই বহু বিবাহ প্রথা ছিল। কিন্তু বেশিরভাগ সমাজবিজ্ঞানীদের অভিমত অনুসারে এক বিবাহ প্রথাই বিবাহের আদিরূপ। তাঁদের যুক্তি হল আদিম সমাজে স্ত্রীলোকের সংখ্যা পর্যাপ্ত ছিল না, গুটিকয়েক অসাধারণ বা সক্ষম ব্যক্তিই শুধু একাধিক বিয়ে করতে পারত (কোনিগ : ১১৫)।

এখানে লক্ষণীয় পরিবার ও বিবাহের উৎপত্তি, বিকাশ নিয়ে সমাজবিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানীদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, ইতিহাস ও সমাজের গতিপ্রকৃতি নির্ধারণে মানুষের জৈবিক প্রেরণা স্মরণাতীত কাল হতে এক বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে, সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মানবিক ও সামাজিক প্রেরণাসমূহ। এজন্য আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীরা মনে করেন যদিও যৌন সম্পর্কের ফলে জীবজগৎ বংশ বৃদ্ধি করে চলছে, তবে সুপ্রাচীন কাল হতে জৈবিক চাহিদা মেটানো এবং বৈধভাবে বংশবৃদ্ধির মাধ্যম হিসেবে বিবাহই একমাত্র আদর্শ পদ্ধতি যা শুধুমাত্র মানব সমাজেই দৃষ্ট। অন্যদিকে মানুষের মানবিক ও সামাজিক চাহিদা পূরণের নিমিত্তে বিবাহ ব্যবস্থার উপরেই ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল আদর্শ মানব পরিবার কাঠামো, যার একটি সর্বজনীন অস্তিত্ব রয়েছে। এজন্য বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী MacIver বলেন, “The family has no origin in the sense that there ever existed a stage of human life from which the family has absent.....” (cited in MacIver: 245). আবার প্রখ্যাত দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল সমাজে পরিবারের গুরুত্ব অনুধাবন করে বলছেন, “In characterising a society, whether ancient or modern, there are two elements, rather closely connected, which are of prime importance : one is the economic system, the other, the family system” (cited in Russell: 1). কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও স্বীকার করতে হবে যে, পরিবার ও বিবাহ ব্যবস্থার কোনটাই নির্দিষ্ট গতিপথে বিবর্তিত হয়নি, বরং বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন ধারায় ও প্রকৃতিতে বিকশিত হয়েছে। মানুষ বিবাহ করে এবং সেইসঙ্গে পরিবার গঠন করে সাধারণত বিশেষ কয়েকটি কারণে যেগুলোর সবকটাই মোটামুটি সকল সমাজে একইভাবে দৃশ্যমান। সমাজবিজ্ঞানীরা কারণগুলো চিহ্নিত করেছেন এরূপ; ক) যৌনানুভূতি, খ) সন্তান লাভের বাসনা, গ) নিজ নাম ও বংশ বৃদ্ধি, ঘ) অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, ঙ) বার্ষিক্যের অসহায় অবস্থায় সহযোগিতা ও সহমর্মিতা লাভের বাসনা, চ) নিজের দুঃখ-বেদনা ও হাসি-আনন্দের সঙ্গী পাওয়া ইত্যাদি (রহমান : ৫০২)

৩.০ বাংলাদেশের পরিবার ও বিবাহ ব্যবস্থা

বাংলাদেশের পরিবার ও বিবাহ ব্যবস্থা আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই প্রয়োজন এদেশের পরিবার ও বিবাহ গঠন কাঠামোর উপর দৃষ্টিপাত করা। প্রসঙ্গত আমরা জানি যে কোন সমাজেই ধর্ম, অঞ্চল, শ্রেণী মর্যাদাভেদ এবং অর্থনৈতিক কারণে পরিবার ও বিবাহ কাঠামো বিভিন্ন রূপ ধারণ করে এবং সে আলোকেই বাংলাদেশের পরিবার ও বিবাহ কাঠামোকে বিশ্লেষণ করতে হবে। বাংলাদেশে প্রধানত দুই ধরনের পরিবার লক্ষ্য করা যায়, যৌথ বা একানুবর্তী পরিবার এবং একক বা অণু পরিবার। বাংলাদেশে পল্লী অঞ্চলে সংখ্যাগত দিক দিয়ে বেশিরভাগ পরিবার যৌথ বা একানুবর্তী শ্রেণীর। পিতা-মাতা, তাদের উপযুক্ত বা অনুপযুক্ত সন্তান-সন্ততি এবং সন্তানদিগের স্ত্রীগণ এবং তাদের সন্তান-সন্ততি মিলে যৌথ পরিবার কাঠামো গড়ে উঠে। ড. ইরাবতী কার্ভে তাঁর, 'Kinship Organization in India' গ্রন্থে যৌথ পরিবারের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, "A joint family is a group of people, who generally live under one roof, who eat food cooked at one hearth, who hold property in common and who participate in common worship and are related to each other at some particular type of kindred" (cited in Das: 281). এদেশের অর্থনীতি হল কৃষিনির্ভর, সুতরাং কৃষিভিত্তিক এ সমাজে সামাজিক মর্যাদা, প্রতিপত্তি এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ভূমি অধিকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এজন্য পরিবারের বাইরে গিয়ে কেউই তাদের ভবিষ্যৎকে বিপদগ্রস্ত করতে চায় না, যেহেতু যৌথ পরিবারের সদস্যরা যৌথভাবে পারিবারিক প্রতিপত্তি ও সম্পত্তির অংশীদার। অন্যদিকে কৃষিকাজের জন্য জনশক্তি হল প্রধান উপাদান। যৌথ পরিবারের সদস্যরা কৃষিতে গুরুত্বপূর্ণ production force হিসেবে কাজ করে, সেজন্য যে কোন কৃষিভিত্তিক সমাজের মত বাংলাদেশের সমাজেও যৌথ পরিবারই সংগঠনের প্রধান রূপ।

যৌথ পরিবার ভিন্ন যে পারিবারিক কাঠামো বাংলাদেশের সমাজে দৃষ্ট তা হচ্ছে একক পরিবার। একক পরিবার বলতে বুঝায় যে পরিবারে স্বামী-স্ত্রী তাদের অবিবাহিত সন্তান-সন্ততি নিয়ে বসবাস করে। বাংলাদেশের একক পরিবারের প্রকৃতি typical পাঁচাত্তমী ধাঁচের একক পরিবারের মত নয় যেখানে 'স্বামী-স্ত্রী-অবিবাহিত সন্তান' এই কয়েকজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে পরিবারের সদস্য সংখ্যা। বাংলাদেশে পিতার বা পরিবারের কর্তার মৃত্যুর পর ভাইয়েরা পৃথক হয়ে গেলেও ছোট বা অবিবাহিত ভাই বা বোন সাধারণ নিয়মে তাদের কারও সাথে স্থায়ীভাবে বসবাস করে, তেমনি বৃদ্ধ বাবা-মাও তাদের কারো না কারো সাথে বসবাস করে। অন্যদিকে সক্ষম সন্তান-সন্ততি পিতামাতার পরিবার হতে পৃথক হয়ে বসবাস করলেও আর্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক নানা ব্যাপারে পিতা-মাতার পরিবারের সাথে সংযুক্তি রক্ষা করে চলতে হয় বা চলে। সুতরাং যৌথ পরিবার ব্যবস্থার বাইরে এটা এক ধরনের যুক্ত পরিবার চরিত্র, যাকে সমাজবিজ্ঞানের ভাষায় বর্ধিত বা extended পরিবার বলা যেতে পারে। তবে বাংলাদেশে একেবারে নির্ভোজাল একক পরিবার যে নেই তা নয়, সাধারণত গ্রামাঞ্চল অপেক্ষা শহরাঞ্চলেই এরূপ পরিবার বেশি দৃশ্যমান এবং এরূপ পরিবারের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে (খান : ১০০)।

কয়েকটি উপজাতীয় পরিবার কাঠামো বাদ দিলে বংশ-মর্যাদা ও সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে বাংলাদেশের পরিবার প্রধানতঃ পিতৃসূত্রীয়। এ ক্ষেত্রে সন্তান-সন্ততি পিতার ধারায় সম্পত্তি, বংশনাম বা মর্যাদা উত্তরাধিকারসূত্রে অর্জন করে। আমরা দেখি অধিকাংশ বাঙ্গালী পরিবারে সন্তানের উপর বাবার প্রভাবই সবচেয়ে বেশি। বাবার পরই মা-চাচাদের প্রভাব, সংসার পরিচালনা থেকে শুরু করে সন্তানের সামাজিকীকরণ সংক্রান্ত কাজ এবং সেই সঙ্গে তাদের বিবাহ করানোর মাধ্যমে পারিবারিক জীবনে প্রবেশ করানোর দায়িত্ব পিতার উপরই বর্তায়। পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে কার ছেলে বা কার মেয়ে প্রশ্ন দুটোর মানে হচ্ছে পাত্র-পাত্রীর পিতার বা পিতৃকুলের পরিচয় কি? অর্থাৎ পিতার বংশ মর্যাদা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, সামাজিক অবস্থান বা আর্থিক পরিচয় কি ইত্যাদি। পিতৃসূত্রীয় রীতিতে পিতার বংশনামই সন্তান-সন্ততি ধারণ করে থাকে। মেয়েদের ক্ষেত্রে বিয়ের পরেও এ ধারা বজায় থাকে, শুধুমাত্র শিক্ষিত কিছু মেয়ে বিয়ের পর নিজের নামের শেষে স্বামীর নাম যোগ করলেও মাতৃকুলের কারও নাম যোগ করে না। তবে সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম হলো মুসলমান মেয়েদের মত হিন্দু মেয়েরা তাদের পিতার পরিবারের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী নয়, যদিও পিতৃসূত্রীয় রীতির ধারাবাহিকতায় পিতার বংশ, নাম ও মর্যাদা তারা ধারণ করে থাকে। বাংলাদেশের পরিবারগুলোর গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল এগুলো কমবেশি দ্বিসূত্রীয়ও। প্রত্যেকটি পরিবার পিতৃকুলের পাশাপাশি মাতৃকুলের সাথেও সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ পরিবারে সন্তানদের উপরে মাতৃসূত্রীয় জ্ঞাতি যেমন, নানা-নানী ও মামা-খালাদের প্রভাব যে নেই তা নয়, বরং বেশীরভাগ ক্ষেত্রে সম্পর্কটা অনেক বেশি আন্তরিক ও মধুর। বিবাহিত কন্যা সন্তানের জন্ম, ভাই-বোনের বিয়ে, ঈদ, পূজা-পার্বণসহ বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে বাপের বাড়িতে গমন করে এবং বাপের বাড়ির প্রতি তাদের এক ধরনের দাবী থাকে যা কখনও শেষ হয় না। সে কারণেই বাবা বা ভাইয়েরা তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী পরিবারের বিবাহিত মেয়েদের প্রতি বিভিন্ন দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে এবং এ কাজকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী এইচ.কে. আরেফিন তাঁর গবেষণায় দেখেছেন কোন পরিবারে পিতৃকুলের চেয়ে মাতৃকুল যদি শিক্ষা, অর্থ ও বংশ মর্যাদায় অধিকতর সুপ্রতিষ্ঠিত ও প্রভাবশালী হয়, সেক্ষেত্রে সন্তানের উপর মাতৃবংশের প্রভাব বেশি পরিলক্ষিত হয় (রহমান : ৫৩৬)।

বাংলাদেশের পরিবার কাঠামোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পরিবারগুলো প্রধানতঃ পিতৃপ্রধান। পারিবারিক ক্ষেত্রে সামাজিক ব্যবস্থাপনা বা নেতৃত্ব দেয়ার ক্ষেত্রে পিতা বা স্বামীই পরিবার প্রধানের ভূমিকা পালন করে। অধ্যাপক ম্যাকইভার ও পেজ বলেন, “Under the patriarchy the family is a closely knit, inclusive system in which all authority (in principle) belongs to the parental side” (cited in MacIver & Page : 249). বলা বাহুল্য বাংলাদেশের পিতৃসূত্রীয় পরিবারের ধারাবাহিকতায় পরিবার কাঠামো মূলতঃ পিতৃপ্রধান। তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণে মায়ের বা স্ত্রীর ভূমিকা একেবারেই যে নেই তা নয়, বরং শিক্ষিত শহুরে পরিবারে অনেক ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই আলোচনাক্রমে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। অন্যদিকে বিবাহভোর বাসস্থানের ভিত্তিতে বাংলাদেশের পরিবারে পিতৃবাস রীতি অনুসরণ করা হয়। বিবাহের পর নারীর স্বামীর বা স্বামীর পিতার গৃহে এসে বসবাস

শুরু করে। আবার এমন উদাহরণও বিরল নয় যেখানে পুরুষেরা বিয়ের পর স্বশুরালয়ে বাস করে। সমাজবিজ্ঞানে একে বলা হয় মাতৃবাস পরিবার পদ্ধতি। উদাহরণস্বরূপ রাখাইন ও গারো সমাজের পরিবার কাঠামোর কথা বলা যায়, যারা পরিবার গঠনে মাতৃবাস রীতির অনুসারী এবং সেই সঙ্গে মাতৃসূত্রীয় ও মাতৃপ্রধান। সাধারণতঃ কোন পরিবারে পুরুষ সন্তান না থাকলে পরিবার প্রধান তার কোন কন্যার স্বামীকে নিজ গৃহে বসবাস করার আমন্ত্রণ জানায়, এক্ষেত্রে জামাতা দ্বারা ছেলের অভাব পূরণের চেষ্টা করা হয়। আবার এমন অবস্থাও রয়েছে যেখানে কর্মহীন অবস্থায় বিয়ে করলে বা পিতা-মাতার অমতে বিয়ে করলে বাধ্য হয়ে অনেক সময় স্বামীকে স্ত্রীর পিতার গৃহে বসবাস করতে হয়। যেসব ক্ষেত্রে পুরুষেরা স্বশুরালয়ে বাস করে তাদেরকে ব্যঙ্গ করে ঘরজামাই বলা হয়। ঘরজামাই স্ত্রীর পরিবারে বা তার নিজের সমাজে কোন মর্যাদা পায় না, তবে স্বগোত্রের সদস্যপদ বা উত্তরাধিকার হারায় না (প্রাপ্ত : ৫০৯)।

বৈবাহিক রীতিতে বাংলাদেশে এক-বিবাহ ভিত্তিক পরিবারই বেশি, যে রীতিতে একজন পুরুষ একজন নারীকে বিয়ে করে। মর্গাণের মতে সভ্যতার স্তরে এটাই পরিবারের প্রধান রূপ, এবং সে অর্থে আধুনিক পরিবার প্রথা (সেন : ১৯১)। তবে গ্রামীণ বহু ধনী মুসলিম পরিবারে পুরুষের একাধিক স্ত্রী রয়েছে। ধনী মুসলিম পরিবারে বহু স্ত্রী রাখা সামাজিক, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পরিচয় বহন করে বলে মনে করা হয়, যদিও এ প্রথার প্রচলন আস্তে আস্তে কমে এসেছে। অন্যদিকে গরীব ও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে একাধিক বিয়ে করার প্রবণতা অল্পবিস্তর এখনও রয়েছে। এক্ষেত্রে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা হতে যৌতুক ও সম্পত্তির লোভে নিম্নশ্রেণীর পুরুষেরা একাধিক বিয়ে করে। তবে সাধারণত অল্প বয়সে স্ত্রী মারা গেলে বা কোন কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেলে পুরুষকে একাধিক বিয়ে করতে দেখা যায়। অন্যদিকে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে বহু-স্ত্রী বিবাহভিত্তিক পরিবারের অস্তিত্ব নেই বললেই হয়। যদিও শাস্ত্রীয় বিধান মতে শুধুমাত্র পুত্রসন্তান লাভের জন্য দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহের অনুমোদন দেয়া হলেও বাস্তবে এরূপ ঘটনা বিরল (মহাপাত্র : ২৭৬)।

বাংলাদেশের পরিবার সংক্রান্ত আলোচনায় পরিবারের কার্যাবলী সম্পর্কেও দৃষ্টি নিবদ্ধ করা উচিত, যেহেতু পরিবার এদেশের সমাজ কাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গই নয় বরং সমাজকাঠামোর চালিকাশক্তিও বটে। পরিবারের মধ্য দিয়েই ব্যক্তির বা সমাজের বিভিন্ন অত্যাবশ্যকীয় কার্যাবলী পালিত হয়। যে কোন সমাজেই পরিবারের মূল কাজ হচ্ছে স্বামী-স্ত্রীর জৈবিক চাহিদা পূরণ এবং সন্তান জন্মদান। মানব সমাজে সন্তান প্রজননের একমাত্র স্বীকৃত সংস্থা হচ্ছে পরিবার। জৈবিক চাহিদা পূরণ এবং সন্তান উৎপাদন ব্যতীত পরিবার কমবেশি আরও কতগুলো কাজ সম্পাদন করে যার মধ্যে অন্যতম শিশুর সামাজিকীকরণ ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কাজ। সামাজিকীকরণ কথাটির অর্থ হল মানুষকে সমাজের রীতিনীতি এবং প্রচলিত প্রলক্ষণগুলোর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে সমাজের সাথে খাপ খাইয়ে চলার মত করে তোলা। বাংলাদেশের পরিবারগুলো শিশুর জন্মের পর হতেই এই কঠিনতম কাজটি পালন করা শুরু করে। শিশুকে যদি সমাজের নিয়মকানুন বা মূল্যবোধ ভালভাবে শেখানো না হয় তাহলে সামাজিক বিশৃংখলা দেখা যায়। একটি পরিবারে শিশু-

কিশোরদের সঠিক সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া পরবর্তী পর্যায়ে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও অপরাধ দমনে তাৎপর্য ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশে শিশু কিশোরদের সমাজের আকাজক্ষিত ধারায় উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে অন্ততঃ আজও পরিবারের কোন যথাযথ বিকল্প সৃষ্টি হয়নি বলে সমাজরিজ্ঞানীরা মনে করেন।

শিক্ষার মহান দায়িত্ব পালন করে পরিবার। পরিবারেই মানুষের শিক্ষার ভিত্তি রচিত হয়; তা সাধারণ বা ধর্মীয় যাই হোক না কেন। বাংলাদেশে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সকল পর্যায়েই পরিবার নানাভাবে ভূমিকা পালন করে। এই ভূমিকা শিশুর শিক্ষার হাতে খড়ি হতে শুরু করে শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার নির্বাহ পর্যন্ত প্রসারিত। শিক্ষার ব্যবস্থা করার পাশাপাশি বাংলাদেশের পরিবারগুলো সন্তান-সন্ততিকে রাষ্ট্রের উপযুক্ত নাগরিক হিসেবেও গড়ে তোলার চেষ্টা করে। পরিবারের প্রধান প্রকৃতপক্ষে পরিবার নামক ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের নায়ক, যিনি তাঁর সদস্যদের অধিকার ও কর্তব্যবোধের পাশাপাশি শৃঙ্খলাবোধ ও নেতৃত্ববোধ শিক্ষা দেন যা সুনাগরিক হবার এক প্রয়োজনীয় গুণ। মানুষের মধ্যে সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ববোধ পরিবার হতেই জন্মে। অন্যদিকে আমরা জানি শিশু প্রাথমিক অবস্থায় খুবই অসহায়, কিন্তু পরিবারই সব ধরনের বিপদ আপদ হতে সন্তানকে রক্ষণাবেক্ষণ এবং নিরাপত্তা বিধান করে মানসিকভাবে আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় উপযুক্ত করে তোলে। তাছাড়া মানুষকে বেঁচে থাকতে হলে কাজের পাশাপাশি মানসিক সতেজতার জন্য আমোদ-প্রমোদের প্রয়োজন হয়। পরিবার এ কারণেই ছেলেমেয়েদের জন্য খেলাধুলা ও ভ্রমণের ব্যবস্থা করে, বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নিয়ে যায় বা অংশগ্রহণ করানোর মাধ্যমে শিশুর মনকে প্রফুল্ল রাখার ব্যবস্থা করে। শুধুমাত্র শিশুদের জন্যই নয় বয়স্কদের আমোদ-প্রমোদ ও চিত্তবিনোদনের কাজও পরিবারের মধ্যদিয়ে হয়ে থাকে। তবে বাংলাদেশের পরিবারগুলোর অন্যতম প্রধান কাজ হল অর্থনৈতিক। এদেশের পরিবারই উৎপাদন, আয় ও ভোগের একক। গ্রামীণ বাংলাদেশের কৃষি পরিবারের নারী পুরুষ সবাই মিলে কৃষি কাজের বিভিন্ন দিকে অংশ নেয়। পরিবারের পুরুষ প্রধান ও অন্যান্য বয়স্ক পুরুষ সদস্য ফসল ফলানো, ফসল তোলা এবং ঘরের বাইরে নানা আর্থিক কাজে লিপ্ত থাকে। পরিবারের মেয়েরা রান্নাবান্না, ঘরসজ্জা, বাড়ির বাগান পরিচর্যা, বীজ ও শস্যাদি সংরক্ষণ এবং গবাদি পশুর পরিচর্যায় অংশগ্রহণ করে। তাছাড়া আজকের দিনের নগর পরিবারের স্বামী-স্ত্রীরা ঘরের বাইরে কাজ করে সদস্যদের ভরন-পোষণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ উপার্জন করে। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, রাষ্ট্র বা কোন প্রতিষ্ঠান পরিবারের অর্থনৈতিক কাজটি সমাধা করে দেয় না। পরিবারের সদস্যদেরকেই তাদের জীবিকা নির্বাহের তাগিদে প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক কাজ করে যেতে হয়।

যাহোক, বাংলাদেশের পরিবার সম্পর্কে বলা যায় এর কাঠামো স্মরণাতীতকাল হতে মজবুত ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে এবং যাবতীয় অত্যাৱশ্যকীয় কাজ বেশ সফলতার সংগেই পালন করে যাচ্ছে। পরিবার, তা সে অণু, বর্ধিত বা যৌথ যাই হোক না কেন জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে আবেগ-ভালোবাসা ও মানসিক বন্ধন অর্থাৎ জ্ঞাতি সম্পর্কের বন্ধন এতই দৃঢ় যে পরিবারগুলো আপন মর্যাদায় ও স্বতন্ত্র

বৈশিষ্ট্যে আজও উদ্ভাসিত। তবে যুগের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের পরিবার সংগঠনের নানা আঙ্গিকে যে পরিবর্তন হচ্ছে না তা নয়। যদিও এদেশের মানুষ এখনও পারিবারিক মূল্যবোধ ও আদর্শকে যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে লালন ও ধারণ করে। এ পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বাংলাদেশের পরিবারের পরিবর্তন ধারা নিয়েও আলোচনা করব, তার আগে বাংলাদেশের বিবাহ ব্যবস্থার নানাদিকের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যেতে পারে।

বস্তুতঃ বিবাহ মানব সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাচীন প্রথা, যার গুরুত্ব এই জন্য যে, প্রথমতঃ বিবাহই মানব-মানবীর সহজাত দেহজ কামনা-বাসনাকে বিধি ও অনুশাসন দ্বারা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে স্থায়ী ও পবিত্র রূপ-প্রদান করে সমাজ সংগঠনের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে। সমাজ ও ব্যক্তির সামগ্রিক স্বার্থে যৌন সম্পর্ক ও আচরণ নিয়ন্ত্রিত হওয়া আবশ্যিক, অন্যথায় সমাজ অজাচারে আক্রান্ত হয়ে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ হারিয়ে বিপর্যস্ত হয়ে পড়তে বাধ্য। দ্বিতীয়তঃ মানব সমাজে বিবাহ শুধুমাত্র যৌন আচরণ নিয়ন্ত্রণকারী একটি ব্যবস্থা নয় বরং বৈধভাবে সন্তান প্রজনন বিবাহের সবচেয়ে মহৎ সর্বজনীন উদ্দেশ্য। বিবাহ ব্যবস্থার মাধ্যমেই সমাজ স্বীকৃত রীতি অনুযায়ী পরিবার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পারিবারিক পরিমণ্ডলে সন্তান প্রজননের মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি ঘটে। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণ তাঁর ‘Religion and Society’ গ্রন্থে বলেন, “Marriage is more a social character for the establishment of a legitimate life than a licence for sexual intercourse” (মহাপাত্র : ৩৩১)। যেহেতু প্রত্যেক সভ্য সমাজেই অবিবাহিত নর-নারীর যৌন সম্পর্ক তিরস্কৃত ও অনৈতিক বলে বিবেচিত হয় এবং এরূপ অবৈধ যৌন মিলনের ফলে যে সন্তান জাত হয় তার সামাজিক পরিচিতি, লালন-পালন, পরিচর্যা এবং শিক্ষা-দীক্ষায় নানারূপ অপূর্ণতা ও ক্রটি থেকে যায় এবং এর কুফল সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে (Goode : 20)। অবৈধ সন্তান সমাজের বোঝা স্বরূপ, সেজন্যই ম্যালোনোঙ্কি তাঁর বৈধ বিবাহজাত সন্তান সম্পর্কিত নীতির উল্লেখে বলেন, “No child should be brought into the world without a man- and one man that assuming the rule of sociological father, that is, guardian and protector, that male link between the child and the rest of the community” (উদ্ধৃত, কর : ২৯৩)। এই নীতিতে Sociological father বলার অর্থ হল নবজাত সন্তানের পিতৃত্ব সমাজে স্বীকৃত হওয়া প্রয়োজন, কেননা পিতৃত্ব অজ্ঞাত থাকলে মাতার অবমাননা হয় এবং সন্তান সমাজে জারজ বলে ধিকৃত হয়। এ ধরনের সমস্যার প্রতিবিধানে বিবাহই হল একমাত্র স্বীকৃত ব্যবস্থা। তৃতীয়তঃ সামাজিক সংহতি রক্ষা এবং সামাজিক সম্পর্কের প্রসারণে বিবাহের তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রয়েছে। বিবাহের মাধ্যমে বর-কনে উভয় পরিবার এবং তাদের দূর ও নিকট সম্পর্কের জ্ঞাতি-কুটুম্বদের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন গড়ে উঠে, যা পর্যায়ক্রমে সামাজিক সম্পর্কের জালকে বিস্তৃত করে এবং একের প্রতি অন্যের সংহতির বুননকে দৃঢ় করে। চতুর্থতঃ বিবাহ নর-নারীর মিলন ঘটিয়ে দেয় সত্য, কিন্তু এই মিলনকে কেবলমাত্র যৌন সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে গেলে ভুল হবে। মানব সমাজে বিবাহের বন্ধন এক অতি পবিত্র বন্ধন, যার মাধ্যমে পাওয়া যায় পারম্পরিক সাহচর্য ও সহানুভূতি, প্রেম-প্রীতি, ভালবাসা এবং সন্তানের প্রতি স্নেহ-মায়া-মমতাসহ এক নিবিড় আত্মিক ও আধ্যাত্মিক অনুভূতি (মহাপাত্র : ৩৩২)। নর-নারী

একে অপরের পরিপূরক, কেননা বিচ্ছিন্নভাবে পুরুষ ও নারী উভয়েই অসম্পূর্ণ। বিবাহের মাধ্যমে যে বুনন সৃষ্টি হয় তা একের অপূর্ণাঙ্গতাকে অপরে যথোপযুক্তভাবে পূর্ণ করতে পারে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য মুসলিম আইনে বিবাহকে সামাজিক চুক্তি বলা হলেও এটা শুধুমাত্র সামাজিক চুক্তিই নয়, আত্মিক চুক্তিও বটে। অনন্তকাল স্থায়ী ও মিলন। পুরুষের পাশে সুখে-দুঃখে নারীও থাকবে এটাই প্রকৃতির নিয়ম (মোস্তফা : ৩৯৮) পঞ্চমতঃ সন্তানের যথোপযুক্ত প্রতিপালন ও পরিচর্যার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। এই নৈতিক দায়িত্বসমূহের মধ্যে থাকে সেবা শূশ্রূষা, বাসস্থান, পরিধেয় বস্ত্র, আহার্য সামগ্রীর ব্যবস্থাসহ সামাজিকীকরণের দীর্ঘায়িত কুর্যধারা। তবে এসব দায়িত্ব কে পালন করবে তা সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন। সমাজে এই দায়িত্ব প্রাথমিকভাবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ পিতামাতার উপরই বর্তায়, যেহেতু সমাজের বৈধ শিশুর সঠিক পরিচর্যা ও সামাজিকীকরণের মাধ্যমে তার Social placement এ তেমন কোন সমস্যার সৃষ্টি হয় না। ষষ্ঠতঃ বিবাহের ধর্মীয় তাৎপর্য অনেক। বিশেষ করে এদেশের হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নিকট বিবাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। হিন্দুদের বিবাহ একটি অবিচ্ছেদ্য বন্ধন যা জন্ম-জন্মান্তর ধরে অব্যাহত থাকে। হিন্দু শাস্ত্রকারগণ বিবাহকে সংস্কার বলেছেন, যার উদ্দেশ্য দেহকে রৈধ উপায়ে পরিমার্জিত ও পরিশোধিত করা। হিন্দু শাস্ত্রে বিবাহের উপর গুরুত্ব আরোপের মূল কারণগুলোর মধ্যে হল; জৈব চাহিদা সমাজানুমোদিত পন্থায় চরিতার্থ করা প্রয়োজন, বংশ বৃদ্ধির জন্য বিবাহ আবশ্যিক এবং বিবাহ ছাড়া লোক-যাত্রা পালন করা সম্ভব নয় (কর : ৩০৯)। অন্যদিকে ইসলাম ধর্মে প্রত্যেক সক্ষম প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য বিবাহকে আবশ্যিক বলে ঘোষণা করা হয়েছে। হযরত মুহম্মদ (সাঃ) বলেন, “যে ব্যক্তি বিবাহ করে, সে তার অর্ধেক ধর্ম পালন করে” (মোস্তফা : ৩৯৭)। ইসলামে বিবাহের মূল উদ্দেশ্য হল ব্যভিচার বা অনাচার হতে সমাজকে রক্ষা করা, যেহেতু ধর্মে বিবাহ বহির্ভূত যৌন সম্পর্ক বা ব্যভিচারের জন্য কঠিন শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। বিবাহের ধর্মীয় তাৎপর্য সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধীর অভিমতও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ, তাঁর মতে, “Marriage is a fence that protects religion. If the fence were to be destroyed, religion would go to pices” (উদ্ধৃত, মহাপাত্র : ৩৬৩)। বিবাহের একরূপ সামাজিক ও ব্যক্তিগত তাৎপর্য আছে বলেই প্রত্যেক সমাজেই নানাবিধ আচার-অনুষ্ঠানাদি পালনের মধ্য দিয়ে বিবাহকার্য সম্পাদিত হয়। এর ব্যাখ্যায় সমাজবিজ্ঞানী এন্ডারসন ও পার্কারের অভিমত হল, বিবাহোৎসবের মাধ্যমে বিবাহের সামাজিক ও ব্যক্তিগত মূল্য সূচিত হয়। বিবাহ জিনিসটি যে কেবল ব্যক্তিগত ব্যাপার নয় বরং এই উপর যে সমাজের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে তা সুস্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে আত্মীয়-কুটুম্ব ও বন্ধু-বান্ধবদের আমন্ত্রণ করে তাদের উপস্থিতিতে বিবাহকার্য সম্পাদিত হয়। তাছাড়া, বিবাহোৎসবে নব-দম্পতিকে পরস্পরের নিকট নানারকম অঙ্গীকার করতে হয় এবং এই অঙ্গীকারের গুরুত্ব যাতে তারা বুঝতে পারে সেজন্য বিবাহানুষ্ঠান সাড়ম্বর অথচ গুরুগম্ভীর পরিবেশের সৃষ্টি করা হয় (এন্ডারসন ও পার্কার : ১৫০)।

পরিবারের মত দেশ-কাল-সমাজভেদে বিবাহ ব্যবস্থারও বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। সমাজবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন মূলনীতির ভিত্তিতে বিবাহ ব্যবস্থাকে শ্রেণীকরণ করেছেন। তবে

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিবাহ ব্যবস্থাকে নিম্নরূপভাবে শ্রেণীবিন্যস্ত করা যায়; (১) একগামিতা বা এক-পতিপত্নী বিবাহ : একগামী বিবাহ ব্যবস্থা হল এককালে কেবল একজনের সঙ্গেই দাম্পত্যজীবন অতিবাহিত করা। বিভিন্ন সভ্য সমাজের মত বাংলাদেশের বিবাহের প্রচলিত রীতি হল একগামিতা। বাংলাদেশের সমাজকাঠামোতে সন্তান প্রজনন ও প্রতিপালন, বয়স্কদের সেবায়ত্ন, সম্পত্তির উত্তরাধিকার নির্ধারণ ও হস্তান্তর এবং রক্ষণাবেক্ষণের জটিলতা এড়ানোর বৈশিষ্ট্যই এরূপ বিবাহকে জনপ্রিয় করেছে। এক্ষেত্রে আরও উল্লেখ্য, যদি স্বামী বা স্ত্রীর কারও একজনের মৃত্যু বা উভয়ের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে তবে স্ত্রী বা স্বামী পুনরায় বিয়ে করতে পারে যাকে সমাজ-নৃতাত্ত্বিকরা ক্রমান্বিত এক-পতি-পত্নী বিবাহ বলেছেন (আহমেদ ও চৌধুরী : ৮৭)। তবে এরূপ অবস্থায় বাংলাদেশের পুরুষরা যত সহজে বিয়ে করতে পারে মহিলারা তা পারে না। সমাজে যে সমস্ত মহিলারা দ্বিতীয় বিয়ে করে তাদের খুব একটা ভাল দৃষ্টিতে দেখা হয় না, সাধারণতঃ খুব অল্প বয়সে বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা হলে অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তার জন্য মহিলারা বাধ্য হয়ে পুনরায় বিয়ে করে। একটু বেশি বয়সের বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা মহিলাদের সাধারণতঃ দ্বিতীয় বিয়ে করতে দেখা যায় না যতটা না দেখা যায় বয়স্ক পুরুষের ক্ষেত্রে; (২) বহুপত্নীত্ব: একজন পুরুষ একই সঙ্গে একাধিক নারীর সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হলে তাকে বলা হয় বহুপত্নীত্ব। ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের চারজন পত্নীর সঙ্গে দাম্পত্যজীবন যাপনের অনুমতি দেয়া হয়েছে, যদিও আল-কোরআনে সকল স্ত্রীর সঙ্গে সমতা রক্ষার শর্ত যুক্ত করে এক-স্ত্রী গ্রহণকে উৎসাহিত করা হয়েছে। কোরআনে নির্দেশ রয়েছে : “শুধু একজন স্ত্রী গ্রহণ কর, কেননা যত চেষ্টাই করো না, তোমার সকল স্ত্রীকে সমানভাবে দেখতে পারবে না” (উদ্ধৃত, মুরশিদ : ১৯৮)। আর্থিক, সামাজিক ও যৌন জীবনের প্রেক্ষিতে সব স্ত্রীকে সমান দৃষ্টিতে দেখা কষ্টসাধ্য এবং প্রথম স্ত্রীর বিনা অনুমতিতে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করা যায় না বলেও শরীয়তের নির্দেশ রয়েছে। তাছাড়া বর্তমানে সরকার কর্তৃক আইন করে প্রথম স্ত্রীর এ অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। অন্যদিকে বৈদিক যুগ থেকেই হিন্দুদের মধ্যে বিশেষ করে কুলীন ব্রাহ্মণদের মধ্যে বহুপত্নীক বিবাহ ব্যবস্থার ব্যাপক প্রচলন ছিল। সে সময় এক একজন কুলীন ব্রাহ্মণের শতাধিক স্ত্রী থাকত। সামাজিক প্রতিষ্ঠালাভের জন্য বা অপেক্ষাকৃত উন্নততর সামাজিক স্তরে উন্নত হওয়ার কামনায় এরূপ উচ্চবর্ণের পাত্রের সঙ্গে বিবাহের ব্যবস্থা করা হত। বর্তমানে এ ধরনের প্রথা অপ্রচলিত হয়ে অবলুপ্ত হয়ে পড়েছে। হিন্দুদের মধ্যে বিশেষ ক্ষেত্রে বংশরক্ষার তাগিদে পুত্রসন্তান লাভের আশায় পুরুষরা পুনরায় বিবাহ করতে পারে, যেহেতু শাস্ত্রে বলা হয়েছে, “পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা” (মহাপাত্র : ৩২৫)। কিন্তু মুসলিম সম্প্রদায়ের তুলনায় হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে বংশরক্ষা বা পুত্রসন্তান লাভের বাসনায় একের অধিক মহিলার সঙ্গে বিবাহের প্রচলন ধর্তব্যের মধ্যে নয়। অন্যদিকে, পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের ভিত্তিতে বাংলাদেশের বিবাহকে অন্তর্গোত্র ও বহির্গোত্র এ দু'ভাগে ভাগ করা যায়। অন্তর্গোত্র বিবাহের ক্ষেত্রে কোন পাত্র-পাত্রীকে অবশ্যই নিজগোত্রের মধ্যে বিয়ে করতে হয়। আর যখন ভিন্ন গোষ্ঠীর নর-নারী পরস্পর বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয় তখন তাকে বহির্গোত্র বিবাহ বলে। অন্তর্গোত্র বিবাহ হিন্দু সমাজেই বেশি প্রচলিত। হিন্দুজাতি বর্ণপ্রথার কাউকে আবশ্যিকভাবে নিজের জাতিবর্ণ বা

উপজাতিবর্ণ থেকে বিবাহের পাত্র-পাত্রী নির্বাচন করতে হয়। অর্থাৎ একজন ব্রাহ্মণ বা কায়স্থকে সেই ব্রাহ্মণ বা কায়স্থ জাতি-বর্ণের ভিতরেই বিয়ে করতে হয়। তবে এ সমাজের সনাতন নিয়মানুযায়ী পিতার বংশে সাত ও মাতার বংশে পাঁচ সিঁড়ি উপরে ও নিচে অবস্থানকারী স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ (কর : ৩০০)। ইসলাম ধর্মের বিধান অনুযায়ী বিবাহের পরিধি সমগ্র মুসলিম সমাজেই বিস্তৃত, কিন্তু সামাজিকভাবে নিম্নতর কিছু কিছু পেশাজীবী যেমন; জোলা, তাঁতীদের মধ্যে অন্তর্গোত্র বিবাহ হিন্দুদের মতই বিধিবদ্ধ। তবে ইসলামে নির্দিষ্ট ১৪ জন ঘনিষ্ঠ মহিলা আত্মীয়ের সঙ্গে বিবাহ নিষেধ (রহমান : ১৩১)। গোত্রভিত্তিক বিবাহের আলোচনার সাথে কাজিন বিবাহের প্রকরণও এ প্রসঙ্গে আলোচনায় আসা উচিত। সমাজ-নৃবিজ্ঞানীরা কাজিন বিবাহকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন যথা; প্যারালাল কাজিন বিবাহ এবং ক্রস কাজিন বিবাহ। প্যারালাল কাজিন বিবাহ বলতে চাচাত ভাইবোন বা খালাত ভাইবোনকে বুঝায়। এক্ষেত্রে একই লিঙ্গের ভাই বা বোনের সন্তানরা পরস্পর প্যারালাল কাজিন। অর্থাৎ দুই ভাইয়ের সন্তানরা পরস্পর প্যারালাল কাজিন তেমনি দুই বোনের সন্তানরা পরস্পর প্যারালাল কাজিন। এ ভিত্তিতে খালাত ভাই বোন এবং চাচাত ভাইবোনের মধ্যে বিবাহকে বলে প্যারালাল কাজিন বিবাহ। প্যারালাল কাজিনকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা যায় যথা; পিতৃসূত্রীয় প্যারালাল কাজিন বিবাহ বা চাচাত ভাইবোনের মধ্যকার বিবাহ, এবং মাতৃসূত্রীয় প্যারালাল কাজিন বিবাহ বা খালাত ভাইবোনের মধ্যকার বিবাহ। বাংলাদেশের মুসলিম সমাজে কাজিন বিবাহের সামাজিক, ধর্মীয় ও আইনগত সমর্থন রয়েছে। পিতৃসূত্রীয় প্যারালাল কাজিন বিবাহকে অন্তর্গোত্র বিবাহের এক রূপ বলে মনে করা যেতে পারে, যেখানে বংশগত কৌলিন্য বজায় রাখা বা গোত্রের মধ্যে সম্পত্তির বন্টন সীমিত রাখতে বিবাহের ব্যবস্থা করা হয়। অন্যদিকে পিতার বোনের সন্তান-সন্ততি এবং মাতার ভাইয়ের সন্তান-সন্ততি হলো ক্রসকাজিন। অর্থাৎ বিপরীত লিঙ্গের ভাই-বোনের (মামাত বা ফুফাত) মধ্যকার বিবাহই হল ক্রস-কাজিন। মুসলিম সমাজে এরূপ বিবাহও ব্যাপকভাবে প্রচলিত, যদিও হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে প্যারালাল কাজিন ও ক্রস-কাজিন উভয় প্রকার বিবাহই শাস্ত্রমতে নিষিদ্ধ (প্রাগুক্ত : ৫৩৩)।

বাংলাদেশের বিবাহ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপগুলো ও পর্যায়ে আমরা আলোচনা করব। সাধারণতঃ এদেশে প্রথাগতভাবে পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন বা বর-কনের পরিচিতজন বিয়ের সম্বন্ধ স্থির করে থাকেন এবং পাত্র-পাত্রীর ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছা, অভিপ্রায় এবং প্রেমভালবাসাকে তেমন গুরুত্ব দেয়া হয় না। উভয় পরিবারের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার মাধ্যমে বিয়ের ব্যবস্থা করা হয়, একে আয়োজিত সামাজিক বিবাহ বলা হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একজন ঘটক বা Matchmaker উভয় পরিবারের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করে। বাংলাদেশের সমাজের বিবাহের পাত্র-পাত্রী নির্বাচন থেকে শুরু করে বিবাহ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত এধরনের মধ্যস্থতাকারী বা ঘটক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে বয়সও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আইন অনুসারে ছেলেদের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন বয়স ২১ এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে তা ১৮। প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত বাল্যবিবাহ নিরোধ করতেই এরূপ আইন করা হয়েছে, কিন্তু

বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে এখনও বাল্য-বিবাহ প্রথা অজানা নয়। আর্থিক দুরবস্থার কারণে কন্যা-দায়িত্ব মেয়ের বাবারা অল্প বয়সে মেয়ে বিয়ে দিয়ে দায়মুক্ত হতে চান। বাংলাদেশে চিরকুমার বা চিরকুমারীর সংখ্যা অতিশয় নগণ্য, যা প্রমাণ করে বয়স্ক পুরুষ ও মহিলাদের সবাই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

সম্ভাব্য পাত্র-পাত্রী নির্বাচন করা হলে বিয়ের প্রস্তাব উপস্থাপন একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্য। সাধারণতঃ এটাই প্রচলিত প্রথা যে ছেলে পক্ষ আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ের প্রস্তাব উপস্থাপন করবে। বর ও কনের গুণ বা যোগ্যতার বিভিন্ন পরিমাপক যেমন; বরের ক্ষেত্রে বয়স, পারিবারিক পরিচিতি, আর্থিক ভিত্তি, শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং কনের ক্ষেত্রে সৌন্দর্য, স্বাস্থ্য, বয়স এবং ক্ষেত্র বিশেষে আয় উপার্জন ক্ষমতা, সাংসারিক কাজে দক্ষতা ইত্যাকার পরিমাপগুলো উভয় পক্ষের মনঃপূত হলে বিয়ের আয়োজন শুরু হয় এবং বিয়েটি কনের বাড়ীতে বা কনের পিতা কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে অনুষ্ঠিত হয়। কনের বাড়ীতে বিবাহ সম্পন্ন হয় বলে কনে পরিবারকে নিজের লোকজন এবং বরযাত্রী দলের জন্য ভোজের ব্যবস্থা করতে হয়। আবার বরপক্ষকেও বিবাহগোর অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হয় যেখানে উভয় পক্ষের আত্মীয়-স্বজনরা নিমন্ত্রিত হয়।

মুসলিম বিবাহের ক্ষেত্রে একজন মওলানা উপস্থিত আত্মীয়-স্বজন বা সাক্ষীদের সামনে পাত্র-পাত্রীর মতামত নিয়ে বিবাহ পড়ান এবং কাজী তা রেজিস্ট্রি করেন, একে কাবিননামা বলা হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কাজীই মওলানার দায়িত্ব পালন করেন। উল্লেখ্য, মুসলমানদের কাছে বিবাহ একটি চুক্তি বিধায় তা রেজিস্ট্রি বা কাবিনভুক্ত করে রাখতে হয়। অন্যদিকে হিন্দু সম্প্রদায়ের বিবাহের আচার অনুষ্ঠানাদি একজন পুরোহিত দ্বারা সম্পন্ন করা হয়। হিন্দু বিবাহ একটি ধর্মীয় আচার তাই মুসলিম বিবাহের মত এর কোন লিখিত রূপের প্রয়োজন নেই। হিন্দু বিবাহ উৎসবে ৬টি অঙ্গ আছে যেগুলো ৪ দিনে অনুষ্ঠিত হয়; ১. গায়ে হলুদ : বিবাহ আরম্ভের প্রাক্কালে বর ও কনের শরীরে হলুদ মাখানো হয়। এক পক্ষ অন্য পক্ষের বাড়ীতে গিয়ে হলুদ দিয়ে আসে, ২. বিবাহ বা সম্প্রদান : প্রথম দিন শুভক্ষণ দেখে সাধারণতঃ মধ্যরাতের পর সম্পন্ন হয়, ৩. বাসি বিবাহ : দ্বিতীয় দিনে সকালে হয়, ৪. উত্তর বিবাহ : দ্বিতীয় দিনে হয়, ৫. পাক স্পর্শ বা স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর রান্না করা খাবার গ্রহণ, যেটি বিবাহের তৃতীয় দিনে করা হয়, ৬. পুনর্বিবাহ : তৃতীয় দিনে অথবা কনের যদি বিয়ের পূর্বে প্রথম ঋতুস্রাব না হয় তাহলে তার প্রথম ঋতুস্রাবের পর অনুষ্ঠিত হয়। এখানে উল্লেখ্য, মুসলিম বিয়েতেও হিন্দু বিয়ের মত গায়ে হলুদের মত আরও কিছু একইরূপ আচার পালন করা হয়, এটা এক ধরনের সাংস্কৃতিক সম্প্রীতির বহির্প্রকাশ (ইসলাম : ১০৮)।

মুসলিম বিবাহে শরীয়তের বিধান মতে কনেকে মোহর বা নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ অবশ্যই পূরণ করতে হয় যা কাবিননামায় লিখিত থাকে। মোহর নির্ধারণের সময় উভয় পক্ষ এক ধরনের দর কষাকষিতে ব্যস্ত থাকে। কনেপক্ষ মোহরের অংক বাড়াতে চায়, বিপরীতক্রমে বরপক্ষ এই অংক কমাতে চায়। তবে এক্ষেত্রে বরপক্ষই নির্ধারণী ভূমিকা পালন করে। মোহরকে দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়-নগদ ও বাকী। নগদ হিসেবে ঘোষিত অংক বরপক্ষ

কর্তৃক কনেকে প্রদত্ত বিভিন্ন উপহার ও স্বর্ণালংকারের মূল্য বাবদ পরিশোধকৃত বলে ধরা হয়, বাকী অংশ শর্তমতে কনে দাবী করলে পরিশোধ করতে হয়, তবে সাধারণতঃ তা আর পরিশোধ করা হয় না যেহেতু কনে তার অংশ কখনও দাবী করে না। শুধুমাত্র স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেলে স্বামী বাধ্য হয় বাকী অংশ পরিশোধ করতে। ইসলামী শরীয়তে স্ত্রীর এই দাবী বা অধিকার পরিশোধের সুনির্দিষ্ট তাগিদ রয়েছে। মুসলিম ও হিন্দু উভয় বিয়েতে ঐতিহ্যগতভাবে বরকে বা বরের পরিবারকে কনের পিতাকে পণ দিতে হত, যাকে সমাজবিজ্ঞানের ভাষায় কনে ক্রয় করা বলা যেতে পারে। পণের ক্ষেত্রে বিয়ের সময় পুরো টাকা পরিশোধ করতে হত। তবে বিয়ের এরূপ ধারা বর্তমানে আর নেই। বাংলাদেশের বিবাহের পরিবর্তন প্রক্রিয়া আলোচনার সময় আমরা এরূপ দান বা পণের বর্তমান রূপ সম্পর্কে আলোচনা করব।

বাংলাদেশে বিয়ের পর একজন স্ত্রী স্বামীর বংশ ও স্বামীর পরিবারের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হয়ে যায় এবং স্ত্রীকে স্বামীর প্রতি কর্তব্য পালনসহ আরও নানারকম দায়িত্ব পালন করতে হয়। তবে ঐতিহ্যগতভাবে এদেশের পরিবার কাঠামোতে শ্বশুর শাশুড়ীর খেদমত করাই বধূর প্রধানতম কাজ বলে মনে করা হয়। তাছাড়া দেবর ননদের প্রতিও স্বীয় দায়িত্ব পালন করতে হয়। ঘরের বধু সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে বা অনাগ্রহী হলে শাশুড়ী-ননদের সঙ্গে মানসিক দূরত্বের সৃষ্টি হয় যা ক্ষেত্রবিশেষে তা পারিবারিক কোলাহলেও রূপ নেয়। এরূপ অবস্থা থেকে সংসারে বিভক্তিসহ নানা অশান্তি নেমে আসে। বাংলাদেশের সমাজে বউ-শাশুড়ী বা ভাবী-ননদের দ্বন্দ্ব যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। সেজন্য পিতা-মাতা কনে খোঁজার সময় এমন কনে বেছে নিতে চান বা তাদের প্রত্যাশা থাকে এমন যে, কনে তাদের পরিবারের সংস্কৃতির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারবে এবং অপিত দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করবে। পুরুষশাসিত এ সমাজে বিশ্বাস করা হয় আয়োজিত সামাজিক বিয়ের মাধ্যমেই এরূপ উদ্দেশ্য পূরণ হতে পারে এবং এ কারণেই আয়োজিত বিবাহই সর্বাধিক জনপ্রিয় এবং বাংলাদেশের সংস্কৃতির সাথে গভীর সম্পর্কযুক্ত (খান : ১০৯)।

৩.১ বিবাহ বিচ্ছেদ এবং বিচ্ছিন্নতা

বিবাহের আলোচনার সাথে অনিবার্যভাবে সম্পর্কযুক্ত বিবাহ-বিচ্ছেদ সংক্রান্ত আলোচনা। যে কোন সমাজেই বিবাহ-বিচ্ছেদ সমস্যা হিসেবে বিবেচিত। বাংলাদেশে বিবাহ-বিচ্ছেদ বা বিচ্ছিন্নতা এদেশের গুরুতর সমস্যাগুলোর মধ্যে অন্যতম। শহরে উচ্চবিত্ত বা মধ্যবিত্তের মধ্যে ব্যক্তিগত ও সাংস্কৃতিক পার্থক্য, চিন্তা ও মূল্যবোধের পার্থক্য, জৈবিক অনুপযোজন এবং কর্মজীবী স্ত্রীর সঙ্গে সাংসারিক বিষয়ে মতদ্বৈধ বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রধান প্রধান কারণ হিসেবে বিবেচিত হয়। গ্রামাঞ্চলে প্রধানতঃ সন্তান জন্মদানে অক্ষমতা, স্বামী কর্তৃক পুনর্বিবাহ, স্ত্রীর পরিবার কর্তৃক যৌতুক পরিশোধ না করতে পারা, দারিদ্র্য বিবাহ-বিচ্ছেদের উল্লেখযোগ্য কারণ হিসেবে বিবেচিত। গ্রামাঞ্চলে নিম্নবিত্ত দরিদ্র মানুষের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদের হার অত্যন্ত বেশি। গ্রামের দরিদ্র মহিলারা বিবাহ-বিচ্ছেদ হলে গুরুতর

সমস্যায় পরে। তাদেরকে বাধ্য হয়ে পিত্রালে ফিরে আসতে হয় এবং এতে পিতৃকুলের উপর বাড়তি চাপ পড়ে। তাদের কেউ কেউ হয়ত পুনরায় বিয়ে করতে পারে, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই জীবিকা অন্বেষণে ঝি-চাকরানীসহ নানা কাজের সন্ধানে নামতে হয়। এমনও হয় যখন কোন আশ্রয় মিলে না তখন মহিলারা অনেক সময় বাধ্য হয়ে বিপদগামীও হয়। হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে বিচ্ছেদ এক জটিল ধর্মীয় ও আইনগত প্রক্রিয়া। তাই হিন্দু দম্পতিরা একে অন্যের বিরাগভাজন হলেও যতদূর সম্ভব সংসারধর্ম চালিয়ে যায়, কেননা তাদের কাছে বিয়ে এক ধর্মীয় অচ্ছেদ্য বন্ধন। অন্যদিকে যে কোন প্রাপ্ত বয়স্ক সুস্থ মনের মুসলিম পুরুষ কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে তার স্ত্রীর সংগে সম্পর্কচ্ছেদ করতে পারে, যাকে তালাক বলে। এটা মৌখিক বা লিখিত উভয়ভাবেই হতে পারে। বিপরীতক্রমে বিবাহ রেজিষ্ট্রি বা কাবিননামায় যদি কনেকে তালাক প্রদানের অধিকার দেয়া হয় তাহলে সে নিজে স্বামীর কাছ থেকে বিচ্ছেদ নিতে পারে। সাধারণতঃ কাবিননামায় কনের এ অধিকার দেয়ার বিষয়টি চেপে রাখা হয়। কাবিননামায় এ অধিকার দেয়া না হলে স্ত্রীকে আদালতে আশ্রয় নিতে হয়। তবে ইসলামী আইনে বিচ্ছেদপ্রাপ্ত স্বামী-স্ত্রী পুনরায় মিলিত হতে পারে, এক্ষেত্রে স্ত্রীকে অন্যত্র বিয়ে দিতে হয়। সেখান থেকে তাকে তিনমাস তিনদিন পর তালাক নিয়ে পূর্বের স্বামীকে বিয়ে করার অধিকার অর্জন করতে হয়, যাকে হিল্লাহ বিবাহ বলে। বস্তুতঃ এর দ্বারা বিবাহ-বিচ্ছেদকে একপ্রকার নিরুৎসাহিত করা হয় বলে মনে করা যেতে পারে (ইসলাম : ১০৯)। যদিও ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অনুসারে তালাকপ্রাপ্ত দম্পতি তিনবার পর্যন্ত পরস্পরকে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে পারে, হিল্লা বিয়ের কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু বাংলাদেশের সামাজিক বাস্তবতায় এমন বিয়ের প্রচলন এখনও প্রাতিষ্ঠানিকিকরণ হয়নি।

৪.০ বাংলাদেশের পরিবার ও বিবাহের সাম্প্রতিক পরিবর্তন ধারা

সকল সমাজেই পরিবার ও বিবাহ কোন স্থিতিশীল ব্যবস্থা নয়। অন্যান্য সামাজিক বাস্তবতার মত পরিবারের কাঠামো, কার্যাবলী এবং বিবাহ ব্যবস্থাতে যুগপৎ পরিবর্তন আসছে। তবে শিল্পোন্নত পশ্চিমা সমাজে বিবাহ ও পরিবারের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গের যত দ্রুত পরিবর্তন ঘটে বাংলাদেশের মত ঐতিহ্যবাহী কৃষিজীবী সমাজে এ পরিবর্তন ধীরলয়ের, কিন্তু এক অনিবার্য প্রক্রিয়া যা এদেশের রূপান্তরশীল অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর সাথে তাল মিলিয়ে পুনর্বিন্যাসের ধারায় এগিয়ে যাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই ঐতিহ্যবাহী যৌথ পরিবার কাঠামো সম্পর্কে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা প্রয়োজন। আমরা জানি, স্বাধীনতার পর শিল্পায়ন ও নগরায়নের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে সঙ্গে কৃষিভিত্তিক অর্থনৈতিক অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে শুরু করেছে এবং সেই সঙ্গে শিল্পায়ন ও নগরায়নের ফলে সৃষ্ট কর্মসংস্থানের যে সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে তাতে অধিকতর উপার্জন সন্ধানী পল্লীজনগণের এক বিরাট অংশ প্রতিনিয়ত গ্রাম ছেড়ে শহর কিংবা নগরে পাড়ি জমাচ্ছে। অন্যদিকে পল্লী পরিবারের শহরে শিক্ষিত সদস্যরা লেখাপড়া শেষে স্থায়ীভাবে শহরেই আবাস গড়ে তুলছে। এ উভয় ক্ষেত্রেই পল্লীর যৌথ পরিবারের সদস্যরা নগরের জটিল সামাজিক বাস্তবতায় স্বামী-স্ত্রী এবং অবিবাহিত সন্তান নিয়ে গড়ে তুলে একক পরিবার

কাঠামো এবং সেই সাথে ক্রমে ক্রমে শিথিল হয়ে যাচ্ছে যৌথ পরিবার ব্যবস্থা ও তার বন্ধন। শিল্প ও নগর সমাজে যৌথ পরিবার ভেঙ্গে এরূপ একক পরিবার গড়ে উঠার পিছনে কারণ অনুসন্ধানে সমাজবিজ্ঞানী টি.বি বটমোর এর নিম্নোক্ত উক্তিটি যথেষ্ট প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, “The independent nuclear family is characteristic of modern industrial societies. Its predominance seems to be due to the growth of individualism reflected in property, law and social ideals of individual happiness and self-fulfilment, and to geographical and social mobility” (উদ্ধৃত, মহাপাত্র : ২৯১)। এরূপ নাগরিক পরিবারের বৈশিষ্ট্য পত্নী অঞ্চলেও কমবেশি লক্ষণীয়। পত্নী অঞ্চলে আজকাল নববিবাহিতরা সীমিত আয়, স্থানাভাব ইত্যাদি নানা কারণে পিতৃগৃহ বাদ দিয়ে নয়াবাস পারিবারিক পদ্ধতি অবলম্বনে একক পরিবার গড়ে তুলছে। নগর বা পত্নী উভয় এলাকাতেই উল্লিখিত কারণে স্বামী-স্ত্রী পরিকল্পিত জনসংখ্যাভিত্তিক পরিবার গড়ে তুলতে আগ্রহী। পূর্বে ধর্মীয় কারণ, কৃষিকাজে labour force বৃদ্ধি, ছেলে সন্তানের প্রত্যাশা, সন্তানের উপর বৃদ্ধবয়সের নির্ভরশীলতা ইত্যাদি নানা অজুহাতে পরিকল্পিত পরিবার গড়ে উঠতে পারেনি, তাই বাংলাদেশে জনসংখ্যা বিস্ফোরণ পর্যায়ে গিয়েছে। বর্তমানে ব্যাপক সরকারি বেসরকারি উদ্যোগ ও প্রচারণায় পরিকল্পিত পরিবার পারিবারিক আদর্শ হিসেবে স্বীকৃতি পাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক জিসবার্টের অভিমত বিশেষভাবে উল্লেখ্য, তিনি মন্তব্য করেন, “----- the introduction and propagation of artificial birth control is undoubtedly a significant change in modern family which reflects most faithfully the change of outlook of modern mind” (উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত : ২৯১)। গণতান্ত্রিক আদর্শ সম্প্রসারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সাম্যের আদর্শও সমাজের সর্বত্র কিছু না কিছু প্রভাব বিস্তার করেছে, পরিবারও এ প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। আজকাল পরিবারগুলোর কর্তৃত্ব, বিশেষ করে শহুরে শিক্ষিত পরিবারে, এককভাবে স্বামীর উপর নয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় স্ত্রীরাও ভূমিকা পালন করে। শহুরে মেয়েদের শিক্ষাদীক্ষা এবং অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা অর্জন পরিবারের ক্ষমতা কাঠামোর এ পরিবর্তনে সহায়তা করেছে। অন্যদিকে পত্নী অঞ্চলে এনজিও এবং বিভিন্ন সরকারি কার্যক্রম নারী ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এনেছে যার প্রভাব পরিবারগুলোতেও পড়ছে।

আজকাল পরিবারের বিধিবদ্ধ কাজকর্মেও ব্যাপক পরিবর্তন আসছে। আধুনিক পরিবারের কোন উৎপাদন কাজ নেই বললেই চলে। পরিবারের লোকেরা খাওয়া-পড়া ছাড়া অন্য কোন অর্থনৈতিক কাজ যৌথভাবে করে না। সেজন্য আধুনিক পরিবারগুলো production unit না থেকে মূলতঃ consumption unit-এ পরিণত হয়েছে। পত্নী অঞ্চলে কৃষিভিত্তিক ও বিভিন্ন বৃত্তিমূলক কাজের বাইরে নানা বিচিত্রমুখী কাজে লিপ্ত। তাছাড়া অবসর ও চিত্তবিনোদন, সন্তানের শিক্ষাদান, নিরাপত্তা বা রক্ষণাবেক্ষণের মত ঐতিহ্যবাহী পারিবারিক কাজগুলো করে দেয়ার মত বিভিন্ন সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়েছে। তাই গৃহের বাইরে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বা কম গুরুত্বপূর্ণ চিরাচরিত কাজ সম্পাদনে বিভিন্ন সংস্থার উপর পরিবার, বিশেষ করে শহুরে পরিবারগুলো ক্রমশ নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। আর এরূপ নির্ভরশীলতার ফলে পিতা-মাতার সঙ্গে শিশুদের একটা মানসিক

দূরত্ব সৃষ্টি হচ্ছে যা ব্যক্তিত্বের সুস্থ বিকাশের অন্তরায়, এবং বিষয়টি গোটা সমাজের জন্যই হুমকিস্বরূপ। অন্যদিকে modernization এবং westernization এর প্রভাবে পরিবারের সদস্যদের জীবনধারা পদ্ধতি মূল্যবোধে ব্যাপক পরিবর্তন আসছে, এবং এ প্রভাব বেশভূষা, চলন-বলন, খানা-পিনার ধরন থেকে শুরু করে জীবনযাত্রার সকল ক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত। তবে শহরাঞ্চলে এ পরিবর্তন যত দ্রুত গ্রামাঞ্চলে হয়ত সে গতিতে নয়, কিন্তু এরূপ পরিবর্তনে যে সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে তা হচ্ছে generation gap- পারিবারিক প্রত্যেকটি বিষয়ে পুত্র-কন্যাদের অভিরূচি এবং জীবনধারা পদ্ধতির সঙ্গে পিতা-মাতা এবং বয়োজ্যেষ্ঠদের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য থেকে যাচ্ছে, ফলে প্রথাগতভাবে পূর্বে সম্মান-সন্ততিদের উপর পারিবারিক শাসন, মূল্যবোধ ও আদর্শের যে ভূমিকা ছিল তা এখন খুবই কম। Children are to be seen not to be heard- এ মতবাদ এখন সেকেলে হয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের পরিবারের বিবর্তন প্রক্রিয়ায় আরেকটি দিক বিশেষ করে উল্লেখ করার মত তা হচ্ছে শহুরে এবং গ্রামীণ পরিবারের মধ্যে cultural এবং structural gap দ্রুত বেড়ে যাওয়ায় নগরের পরিবারের সদস্যরা অনেকেই এখন আর গ্রামীণ জ্ঞাতিগোষ্ঠীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে না বা পারছে না। ফলে ঐতিহ্যবাহী আত্মীয়তার সম্পর্ক ধীরে ধীরে ক্ষয়ে যাচ্ছে। পারিবারিক নানা বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বয়স্ক জ্ঞাতিগোষ্ঠীদের ভূমিকা এখন প্রায়শই গুরুত্বহীন। অন্যদিকে আমরা জানি পরিবারের ভিত্তি রচিত বিবাহের মাধ্যমে। পরিবারের সাথে সাথে বিবাহ ব্যবস্থার নানা আঙ্গিকেও যুগপৎ পরিবর্তন আসছে এবং একটির পরিবর্তন অন্যটিকে প্রভাবিত করছে। বিবাহের আলোচনায় প্রথমেই উল্লেখ্য পাত্র-পাত্রী নির্বাচন প্রসঙ্গ। পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে বয়স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণ এবং সরকার কর্তৃক আইন পাশের কারণে বিবাহের বয়স এখন বৃদ্ধি পেয়েছে, বাল্যবিবাহ একেবারেই কমে এসেছে। এখনকার শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা অর্থনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত না হয়ে বিয়ে করছে না। তেমনি মেয়েরাও লেখাপাড়া শেষ না করে বিয়ে করতে চাচ্ছে না। সরকার প্রদত্ত মেয়েদের জন্য উপবৃত্তি কার্যক্রম, বিভিন্ন বেসরকারি সামাজিক সংস্থাগুলোর বাল্যবিবাহ বিরোধী প্রচারণা এবং শিক্ষার প্রসারে অবদান এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে কার ছেলে, কার মেয়ে বা বংশ মর্যাদা কি এসব পরিমাপকের গুরুত্ব আস্তে আস্তে কমে গিয়ে বরং পাত্র-পাত্রীর শিক্ষা, অর্থনৈতিক প্রতিপত্তি বা যোগ্যতা কি এসব উল্লেখযোগ্য নির্ণায়ক হিসেবে কাজ করছে। পারিবারিক মূল্যবোধের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠদের একচেটিয়া কর্তৃত্ব এখন কম। শহুরে শিক্ষিত পরিবারে পাত্র-পাত্রীর মতামতকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়, এবং সেজন্যই হয়ত বিয়ের ক্ষেত্রে romantic marriage এর সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। তবে আশার কথা, সকল ক্ষেত্রেই শিক্ষিত, অশিক্ষিত, উচ্চ, মধ্য ও নিম্নবিত্তের মধ্যে বহুবিবাহের প্রবণতা আস্তে আস্তে কমে এসেছে। প্রথম স্ত্রী রেখে এবং তার অনুমতি ব্যতীত দ্বিতীয় স্ত্রী

গ্রহণের আইনগত ও সামাজিক বাধা এবং ব্যাপক সামাজিক প্রচারণা এ ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

তবে দুঃখজনক সত্য হল পরিবর্তিত সামাজিক পরিস্থিতিতে যে কুপ্রথাটি বাংলাদেশের বিয়ের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে গেছে তা হচ্ছে যৌতুক। যৌতুক বাংলাদেশের বিয়েতে প্রধানতম সমস্যা, যা সমাজে একটি সাধারণ রীতি হিসেবে বিবেচিত। যৌতুক ঐতিহ্যবাহী কনে ক্রয়, পণপ্রথা বা মোহরানার উল্টো অবস্থা যেখানে বিয়েতে বরকে মোটা অংকের যৌতুক দিতে হয়। কন্যা-দায়গ্রস্ত দরিদ্র, নিম্নবিত্ত এবং মধ্যবিত্তের মধ্যে এই যৌতুক ব্যাপকভাবে প্রচলিত। বিয়ের পূর্বে সাধারণতঃ বরপক্ষ থেকে যৌতুকের চাহিদাপত্র কন্যার পিতার কাছে পাঠানো হয়। এ ধরনের দাবী পূরণ কন্যার পিতাকে ঋণগ্রস্ত করে ফেলে। মেয়ে দেখতে সুন্দর হলে এ দাবীর পরিমাণ কিছুটা কমে, বিপরীতক্রমে ছেলের যোগ্যতা বেশি হলে দাবীর পরিমাণও বাড়ে। আবার এমন অবস্থাও হয় যেখানে কন্যার বাবা যৌতুকের দাবী মেটাতে পারে না বলে অনেক মেয়েকে আইবুড়ো থাকতে হয়। তেমনি আশানুরূপ যৌতুক পায় না বলে এবং বিনা যৌতুকে বিয়ে করতে অপারগ যুবকদেরও সঠিক সময়ে বিয়ে হচ্ছে না (সেন : ১৮৭)। হিন্দু বিয়েতে যৌতুক একটি সাধারণ ঘটনা, হিন্দু মেয়েরা পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী নয় বলে কন্যার বাবাকে বিয়ের সময় আবশ্যিক সব কিছুই দিয়ে দিতে হয় যা তাদের জন্য এক অসম্ভব বোঝাস্বরূপ; বোঝা হলেও এ থেকে কোন পরিত্রাণ নেই। উল্লেখ্য, সমাজের উচ্চবিত্ত ধনীরা সম্ভ্রষ্ট হয়ে যৌতুক দিয়ে থাকে, যোগ্য পাত্রকে বেশি যৌতুক দিতে পেরে তারা গর্বিত হয় যেহেতু তারা মনে করে এটা তাদের জন্য সামাজিক প্রতিপত্তি ও সম্মান নির্দেশক। পাত্র ক্রয়ের এ নব্য প্রথাকে সমাজবিজ্ঞানীরা প্রচলিত market system এর বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তুলনা করেছেন (Goode : ৩২)। যৌতুক বিরোধী আইন থাকা সত্ত্বেও এ প্রথা অবলুপ্ত হয়নি বরং যৌতুকের কারণে স্ত্রীর উপর নানা প্রকার অন্যায় অত্যাচারের বীভৎস চিত্র প্রতিনিয়ত নজরে আসে। তত্ত্বগতভাবে বরকে যৌতুক দেয়ার মাধ্যমে মেয়েদের মর্যাদা ও অধিকার রক্ষিত হবার কথা, কিন্তু বাস্তব অবস্থা ভিন্ন। বিয়ের পর স্বামীর ঘরে যে উপযোগ সৃষ্টি হয় তার কোন সামাজিক মূল্য স্বীকৃত হয় না বরং বিয়ের মাধ্যমে যে বাড়তি বোঝা (!) ছেলেটি নিচ্ছে, তার প্রতিদান মাঝে মাঝেই দিতে হয়। সেজন্য বিয়ের সময়ই যৌতুক দেবার পালা একেবারেই শেষ হয় না, ক্ষেত্র বিশেষে দফায় দফায় ছেলেপক্ষ নানা ধরনের উপহার সামগ্রী, অর্থ, সম্পত্তি দাবী করে এবং স্ত্রী তা এনে দিতে না পারলে জুলুম, অত্যাচারের মাত্রা বাড়তে থাকে, যার সর্বশেষ পরিণতি হচ্ছে বিবাহ বিচ্ছেদ বা স্বামী স্ত্রীর পৃথক অবস্থান (মুরশিদ : ৪৪)। বিশেষ করে নিম্নবিত্ত দরিদ্র পরিবারের বিয়েগুলো যৌতুকের দাবীর মুখে তাসের ঘরের মত ভেঙ্গে পড়ে।

বিবাহের পরিবর্তনের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদের সাম্প্রতিক প্রবণতাসমূহও আলোচনায় আসতে পারে। প্রথমতঃ হিন্দু বিয়েতে শাস্ত্রমতে স্বামী-স্ত্রীর বন্ধন অচ্ছেদ্য হলেও আজকাল আইনের আশ্রয়ে স্বামী-স্ত্রী আলাদা হতে পারে এবং প্রয়োজনে হচ্ছেও। দ্বিতীয়তঃ স্বামী-স্ত্রী উভয়ই উপার্জনশীল শিক্ষিত সমাজের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদের পরিমাণ

আশংকাজনকভাবে বেড়ে যাচ্ছে। মূলতঃ ব্যক্তিত্বের সংঘাত বা superiority পড়সড়ষী এর প্রধানতম কারণ। তৃতীয়তঃ পূর্বে দেখা যেত স্বামীই স্ত্রীকে তালাক দিচ্ছে, আজকাল এ পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে। বর্তমানে স্ত্রী কর্তৃক আইনী আশ্রয়ে স্বামীকে তালাক দেয়ার ঘটনাও যথেষ্ট ঘটছে। চতুর্থতঃ উচ্চবিত্ত অনেক পরিবারে দেখা যায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আইনগত বিচ্ছেদ না হলেও তারা বিচ্ছেদের মধ্যে বসবাস করছে। স্বামী-স্ত্রী নিজস্ব স্বতন্ত্র সামাজিক পরিমণ্ডল গড়ে তুলে সংসার-ধর্ম থেকে দূরে সরে যায়। এক ঘরে বসবাস করেও তারা যেন অচেনা, অজানা।

এতক্ষণ সংক্ষিপ্ত পরিসরে আমরা বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে পরিবার ও বিবাহের সাম্প্রতিক পরিবর্তন ধারা নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। এসব পরিবর্তন ধারা দেখে স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগতে পারে, তাহলে পরিবার ও বিবাহের ভবিষ্যৎ কি, পরিবার ও বিবাহ যুগপরম্পরতায় টিকে থাকবে কিনা, ইত্যাকার নানা প্রশ্ন। এ সন্দেহ অমূলক নয়, সেজন্য আলোচনার এ পর্যায়ে আমরা দেখতে চেষ্টা করব পরিবার ও বিবাহের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানীদের অভিমত।

৫.০ পরিবার ও বিবাহের ভবিষ্যৎ

পরিবার ও বিবাহ থাকবে কি থাকবে না, এ প্রসঙ্গে সমাজবিজ্ঞানীরা নানা অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ক্রিয়াবাদী সমাজবিজ্ঞানীদের অভিমত অনুসারে সমাজ হল কতগুলো অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠানের সমষ্টি যেগুলোর উপর ভিত্তি করে পুরো সমাজকাঠামো গড়ে উঠে। যেসব অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান সময়ের স্বাভাবিক গতিধারায় কাজ করতে অক্ষম সেগুলোর পরিপূরক হিসেবে জন্ম নেয় নতুন অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান, এবং পুরানোগুলো স্বাভাবিক নিয়মেই বিদায় হয়ে যায়। শিল্পায়ন ও নগরায়নের অভাবনীয় উন্নতির ফলে আধুনিক সমাজে পরিবারের অস্তিত্ব ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এ ধরনের সমাজবিজ্ঞানীরা মোটেই সন্দেহমুক্ত নন। তাঁদের মতে পরিবারের অনেক প্রাচীন দায়-দায়িত্ব শিক্ষালয়, রাষ্ট্র ও সমাজের উপর অর্পিত হয়েছে। ফলশ্রুতিতে পরিবারের প্রয়োজনীয়তা আস্তে আস্তে কমে এসেছে (সেন : ১৯৬)। অর্থাৎ পরিবারের পরিপূরক বিভিন্ন অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান তাদের কার্যাবলী দ্বারা পরিবারকে প্রায় গুরুত্বহীন করে তুলেছে। এ ধরনের সমাজতত্ত্ববিদদের অভিমত অনুযায়ী সন্তান প্রজনন এবং নবজাতককে প্রথম দু-এক বছর লালন-পালন করার মধ্যেই পরিবারের ভূমিকা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ছে। ভবিষ্যতে অন্য কোন ভূমিকায় একে হয়ত আর দেখা যাবে না (মহাপাত্র : ২৯৮)। অন্যদিকে sexual liberty, living together, test tube ব্যবস্থায় বৈজ্ঞানিকভাবে সন্তান উৎপাদন পদ্ধতি, সন্তান প্রজননে অনাগ্রহ পাশ্চাত্য সমাজে পরিবারকে গুরুত্বহীন করার পাশাপাশি বিবাহের সংখ্যাও কমিয়ে দিয়েছে। বিবাহের মাধ্যমে সন্তান লাভে সর্বোচ্চ সামাজিক ও ব্যক্তিগত লক্ষ্য থাকলেও এসব সমাজে এসব আর আগের মত এতটা অপরিহার্য নয় বলে ক্রিয়াবাদী সমাজবিজ্ঞানীরা মনে করেন। তাছাড়া শিল্পোন্নত সমাজে বিবাহ-বিচ্ছেদের হার অত্যধিক বৃদ্ধিও পরিবার এবং বিবাহের

অস্তিত্বে হুমকীর মুখে ফেলে দিয়েছে। ক্রিয়াবাদী চিন্তাবিদদের অভিমত অনুসারে এই প্রক্রিয়াই হয়ত একসময় মানব সমাজে পরিবার ও বিবাহ ব্যবস্থার অবসান ঘটবে।

অন্যদিকে মার্কসবাদী সমাজবিজ্ঞানীদের মতে পুঁজিবাদী সমাজে পরিবার হচ্ছে মানবতার বা বিশেষ করে মেয়েদের জন্য শোষণমূলক প্রতিষ্ঠান। এঙ্গেলস তাঁর “The origin of the Family, Private Property and the State” গ্রন্থে বলেন সমাজে পুরুষের আর্থিক ক্ষমতার উপর মেয়েরা নির্ভরশীল, আর্থিক ক্ষমতা সমান না হওয়া পর্যন্ত মেয়েদের অধিকার প্রতিষ্ঠা হওয়া অসম্ভব। তাঁর মতে শুধুমাত্র সমাজতন্ত্র এবং সাম্যবাদই মেয়েদের স্বাধীনতা এনে দেবে এবং সমান অধিকার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করবে। তিনি আশা করেন মেয়েদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলে তারা বিবাহের মাধ্যমে পণ্য হিসেবে বিক্রি হবে না এবং আস্তে আস্তে প্রচলিত বিবাহ ও পরিবার ব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘটবে (নকী : ১৪৭)। মার্কসবাদী সমাজবিজ্ঞানীরা এমন একটি সময়ের আশা করেন যখন পুরুষ ক্ষমতা বা টাকার বলে মেয়েদের কিনতে পারবে না এবং মেয়েরা পুরুষদের কাছে আত্মসমর্পণ করবে না। তাঁদের মতে সাম্যবাদই হল সে আদর্শগত ব্যবস্থা (রহমান : ১২৩)।

তৃতীয় ধারার রক্ষণশীল সমাজতাত্ত্বিকরা মূলতঃ ধর্মীয় ও নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে পরিবার ও বিবাহের ভবিষ্যৎ বিশ্লেষণ করেন। তাঁরা মনে করেন পরিবার ও বিবাহ না থাকলে সমাজে অনাচার, ব্যভিচার বা অবাধ যৌনাচার দেখা দিবে এবং সামাজিক সংহতি ও শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়বে, যা হবে সমাজের জন্য খুবই ক্ষতিকর। সে আলোকে ফ্রেজার, লে, বেন এর মত বিখ্যাত সমাজ ও নৃতাত্ত্বিকরা পরিবার ও বিবাহের বিলুপ্তি হবে না বলেই মনে করেন; এগুলো অতীতে ছিল, বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। এরূপ আশাবাদী সমাজতাত্ত্বিকদের মতে পরিবার ও বিবাহ ব্যবস্থার সাংগঠনিক ক্ষেত্রে যে অস্থিরতা বিরাজ করছে তা ক্ষণস্থায়ী, অচিরেই এ অস্থিরতার অবসান হবে এবং পরিবার ও বিবাহের স্থায়ীত্ব সুদৃঢ় হবে। মূলকথা sexual liberty, living together, বিবাহ বিচ্ছেদ, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সন্তান প্রজনন, বা সন্তান প্রজননে অনাগ্রহ এসব কোন আদর্শ নয়। সমাজের স্থিতিশীলতার জন্য বিবাহ ও পরিবারের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য এবং ভবিষ্যতে আরও বাড়বে। এ আলোকেই এন্ডারসন ও পার্কারের মত রক্ষণশীল সমাজবিজ্ঞানীরা আগামীতে পরিবার ও বিবাহ ব্যবস্থায় স্বর্ণযুগ আসছে বলে অভিমত পোষণ করেন; “Entrance into marriage primarily on an affectional basis, the reduction of economic pressures, and the voluntary bearing and rearing of children would appear in the long run to provide the soundest foundation of an enduring family” (Anderson & Parker : 176-177) সমাজের জন্য এর থেকে আদর্শ ব্যবস্থা আর কিছুই হতে পারে না। যাহোক, সময়ের সাথে সাথে পরিবার ও বিবাহের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলোতে কিছু কিছু পরিবর্তন যে আসছে না তা নয়। কিন্তু এর অস্তিত্ব হুমকীর মুখে-এ অভিমত ঠিক নয়। আর বাংলাদেশের মত সমাজে পরিবার ও বিবাহের বিকল্প যথার্থ ব্যবস্থা ও পরিস্থিতির উদ্ভব এখনও হয়নি। আমাদের সমাজে পরিবার ও বিবাহ ব্যবস্থার বাইরে গিয়ে নির্বিঘ্ন সুস্থ জীবন যাপন সম্ভব নয়, এবং সমাজের কাছে তা

গ্রহণযোগ্যও নয় যেহেতু ব্যক্তি মানুষের জন্য তা কোন আদর্শ বা কল্যাণকর কিছু নয় এবং হতে পারে না।

৬.০ উপসংহার

এতক্ষণ আমরা বাংলাদেশে পরিবার ও বিবাহের নানা বৈশিষ্ট্য, পরিবর্তন প্রক্রিয়া এবং সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। পরিবার ও বিবাহ মূলতঃ সমাজবিজ্ঞান এবং সামাজিক নৃবিজ্ঞানের দুটো গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয়। সমাজবিজ্ঞানীরা মনে করেন সমাজে সুন্দর ও সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টির পরিকল্পনায় যে সব সামাজিক প্রথা, প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে সেগুলোর মাঝে পরিবার এবং বিবাহ সবচেয়ে আদিম ও মূল্যবান; যেগুলোর উপর ভিত্তি করে সামাজিক জীবনের গোড়া পত্তন হয়েছে। পরিবার ও বিবাহের রূপ ও বৈশিষ্ট্য সকল সমাজেই এক এবং নির্দিষ্ট নয়; সমাজ-সংস্কৃতি ভেদে ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যতা পরিলক্ষিত হয়, তেমনি এসবের কার্যাবলীতেও যুগপৎ পার্থক্য রয়েছে। তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, পরিবার ও বিবাহের অস্তিত্ব নেই এমন সমাজের কথা সমাজবিজ্ঞানীদের জানা নেই। পরিবার ও বিবাহ ব্যবস্থায় যে পরিবর্তন তা স্বাভাবিক সামাজিক বাস্তবতা, যা অন্যান্য সামাজিক প্রপঞ্চতেও অনিবার্যভাবে ঘটে থাকে। এসব পরিবর্তন দ্বারা এটা বুঝায় না যে পরিবার ও বিবাহের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়েছে এবং এগুলো ধ্বংস হয়ে যাবে। সমাজবিজ্ঞানীদের অভিমতে মানব ইতিহাসে হাজার হাজার বছর ধরে পরিবার ও বিবাহ ব্যবস্থা চলে এসেছে, তাই এগুলোর যাত্রা অবিচলভাবেই চলবে। স্নেহ-মমতা, দুঃখ-দুর্দশা, জরাজীর্ণতা ও মৃত্যুতে মানুষ পরিবারের কাছেই আশ্রয় খুঁজে, কারণ যুগ যুগ ধরে একমাত্র পরিবারই পেয়েছে সমস্ত মানবিক প্রয়োজন মানবিকভাবেই মেটাতে। তাই এটা অনস্বীকার্য, বাংলাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটে আমরা এখনও এমন অবস্থায় নেই বা আসতে পারিনি যেখানে পরিবার ও বিবাহের কাছে কোনরূপ আশ্রয়ের প্রয়োজন নেই, বরং ক্ষেত্রবিশেষে প্রয়োজন দিন দিন বাড়ছে। আর সে জন্যই হয়ত এদেশের সামাজিক বন্ধন আজও সুস্থ অবয়বের উপর দাঁড়িয়ে আছে এবং সামাজিক মূল্যবোধ ও আদর্শ অটুট আছে।

তথ্য নির্দেশিকা

আহমেদ রেহনুমা ও চৌধুরী, মানস : নৃবিজ্ঞানের প্রথম পাঠ : সমাজ ও সংস্কৃতি (২০০৩)
একুশে পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ঢাকা।

ইসলাম, সিরাজুল ও অন্যান্য (সম্পাদিত) : বাংলাপিডিয়া (২০০৩) বাংলাদেশ এশিয়াটিক
সোসাইটি, ঢাকা, ভলিউম-৬ ও ৭।

কর, পরিমল ভূষণ : সমাজতত্ত্ব (১৯৯২) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা
করিম, নাজমুল : সমাজ বিজ্ঞান সমীক্ষা (১৯৮৪) নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা
কোনিগ, স্যামুয়েল (অনুদিত) : সমাজ বিজ্ঞান (২০০২) জে.কে প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স,
ঢাকা।

খান, ফজলুর রশিদ : বাংলাদেশ সমাজতত্ত্ব (১৯৭৪) শিরীণ পাবলিকেশন্স, ঢাকা
নকী, সৈয়দ আলী ও ইসলাম, মোঃ নজরুল : সমাজবিজ্ঞান পরিক্রমা (১৯৯৩) সর্বজনীন
গ্রন্থালয়, ঢাকা।

মর্গান, লুইস হেনরি (অনুদিত) : আদিম সমাজ (১৯৮৫) বাংলা একাডেমী, ঢাকা
মহাপাত্র, অনাদিকুমার : বিষয় সমাজতত্ত্ব (২০০০) ইন্ডিয়ান বুক কনসার্ন, কলিকাতা
মুরশিদ, নূরজাহান (সম্পাদিত) : এদেশ একাল : নারী (২০০১) প্রতিভাস, ঢাকা
মোস্তফা, গোলাম : বিশ্বনবী (২০০০) আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা
রহমান, মুহাম্মদ হাবিবুর : সমাজবিজ্ঞান পরিচিতি (১৯৯৮) হাসান বুক হাউজ, ঢাকা
সেন, রংগলাল : সমাজ কাঠামো, পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র (২০০২) নিউ এজ
পাবলিকেশন্স, ঢাকা

হোসেন, মোকাররম : সমাজ ও সমাজতত্ত্ব (১৯৭৫) বাংলা একাডেমী, ঢাকা

Anderson & Parker : *Society- Its Organization and Operation* (1966)
Affiliated East-West Press Pvt. Ltd. New Delhi.

Bottomore, T.B : *Sociology* (1962) Unwin University
Books, London.

Das, G.: *Principles of Sociology* (1999) King Books, Delhi.

Goode, Williams: *The Family* (1975) Prentice Hall of India Private Limited,
New Delhi.

Kadetotad, N.K : *Family & Marriage* (1979) B.R Publishing Corporation,
Delhi,

MacIver, R.M. & Page, C.H : *Society* (1959) Macmillan & Co, Ltd. : London

Russell, Bertrand : *Marriage and Morals* (1985) Unwin Paperbacks, London
West Press Ltd.. New Delhi.